KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সারকুলার মার্কেট (গ্রাউন্ড ফ্লোর), কলি-৭৩
Collection : KLMLGK	Publisher : সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই)
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 9/4 10/4 11/1 11/2	Year of Publication : Oct 1986 July-Sep 87 Feb 1988 June 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সম্পাদক (নাম উল্লেখ নেই)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৩৯

বিশেষ সংখ্যা

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শীত সংখ্যা ১৩৯৪

সূচি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত
ও টেক্‌নোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বিভাব বারো বছরে পড়ল। নানা নিয়ন্ত্রণঅযোগ্য কারণে অনেকসময়ই আমরা সঠিক সময়ে কাগজ প্রকাশ করে উঠতে পারি না। কাগজ প্রকাশের নানা ব্যবহারিক সমস্যা বাদ দিলেও যোগ্য লেখার জন্য অপেক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে মূল আক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। একান্ত প্রতীক্ষার পরও যে লেখা পাই, তাতে অনেক-সময়ই খুশি হতে পারি না।

আবার এই বারো বছরে যে উনচল্লিশটি (এই সংখ্যা ধরে) সংখ্যা বিভাবের প্রকাশিত তাতে বহু উল্লেখযোগ্য রচনা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বহু রচনাই স্মৃতিধার্য হয়ে ওঠেনি। অনেক লেখা পাঠকদের ভাল লাগলেও আমরা নিঃসংশয় হতে পারিনি। যারা দীর্ঘদিনের গ্রাহক পাঠক তারা জানেন প্রথম সাত-আট বছরে কি সব তীক্ষ্ণমেধা বহুআলোচনাধন্য প্রবন্ধ বিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ! ভাল কবিতা গল্প পেলেও ভালো প্রবন্ধ ক্রমশই অঙ্গুলিমেয় হয়ে উঠছে। গল্প-কবিতা-উপন্যাস যদি সাহিত্যের মূল লাবণ্য হয়, প্রবন্ধ হচ্ছে সেই মেরুদণ্ড যার ওপর ভিত্তি পায় ভাষার যাবতীয় নির্মিতি। বিভাবের জন্য অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রার্থনা করবো আমরা।

এ বছর অকাদেমী পুরস্কার পেলেন আমাদের পরম প্রিয় কবি অরুণ মিত্র। প্রান্ত-পঁচাত্তরের (না অতিক্রান্ত !) এই কবি, শব্দ যার কাছে কখনই বয়সবিনীত নয়, যার মিতবাক কাব্যনির্মাণ এখনো তারুণ্যের অরুণালোকে দীপ্ত, সেই সার্থকনামা অরুণ মিত্রকে অভিনন্দন জানাই, কামনা করি তাঁর সৃষ্টিমগ্ন দীর্ঘজীবন।

এই সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মূল কাহিনী অবলম্বনে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 'ফেরা'র সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭-র শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবি বহুকাল পরে এ বছর বার্লিন ফিল্ম উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসাবে প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর আগেও বিভাবে 'আকালের সন্ধানে' 'শোধ' 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবিগুলির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এদের কিছু কপি এখনো বিভাবের দপ্তরে পাওয়া যায়।

'ফেরা' এখনো মুক্তি পায় নি। মুক্তির আগেই এর চিত্রনাট্য প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। চিত্রনাট্যটি কপি করে দিয়েছেন ধীমান দাশগুপ্ত। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

উপহার

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ছবি

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

ফেরা

THE RETURN

কাহিনীসূত্র : শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সংক্রামক' গল্প
প্রযোজনা : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
সংযুক্ত পরিচালক : বিশ্বদেব দাশগুপ্ত
ক্যামেরা : ধ্রুবজ্যোতি বসু
সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী
সঙ্গীত : জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্ত
শব্দগ্রহণ : অনুপ মুখোপাধ্যায় (এন. এফ. ডি. সি.)
কর্মসচিব : সোমনাথ দাশ

চ রি ত্র লি পি

শশাংক : সুব্রত নন্দী
সরযূ : অলকানন্দা দত্ত
কানু : অনিকেত সেনগুপ্ত
রাসু : সুনীল মুখার্জি
কল্যাণী : ছন্দা দত্ত
যমুনা : দেবীকা মুখার্জি
সরল : বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়
মন্টু দত্ত : কামু মুখোপাধ্যায়
বাবলু : সমিত ভঞ্জ (অতিথি শিল্পী)
অন্যান্য ভূমিকায় : আশিস চক্রবর্তী, প্রদীপ সেন, মনু মুখার্জি

দৃশ্য ১ : রাত্রি

বিগ ক্লোজআপ :

শশাংকর মেক-আপের দৃশ্য। বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন শটে মিক্স করে এই দৃশ্য দেখানো হয়।

আবহসংগীত শুরু হয়।

বিগ ক্লোজআপে শশাংকের মেকআপরত মুখ ফ্রীজড হয়ে যায় ও তার ওপর একটি পরিচয়লিপি পড়ে। গ্রাম-ঘেঁষা মফঃস্বল শহর। একটি যাত্রার শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

লং শট : রাজার বেশে শশাংক অভিনয় করছে সেই শেষ দৃশ্যে। বাইরে ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ায় দুলছে বড় বড় পেট্রোম্যাক্সের আলো। লোকজনের মুখ শঙ্কিত। হঠাৎ একটি আলো হাওয়ার ঝাপটায় উল্টে পড়ে নিচে।

শশাংক সংলাপ বলে যায় : "স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন, হায় স্বপ্ন কি আমিও দেখিনি? আমিও কি চাইনি সুবে-বাংলার প্রতিটি নরনারী আমার এ স্বপ্নে সাড়া দিক? কিন্তু আমার সে স্বপ্ন ভেঙেচুরে এ তুমি আজ আমায় কোথায় এনে দাঁড় করালে মীরজাফর। তুমি কি ভেবেছিলে মীরজাফর, আমি শুধু রাজ্যের লোভে রাজা সেজেছি, শুধুই সনদের লোভে? না, না মীরজাফর, ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে। আর একদিন ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকতার আর এক নাম হবে মীরজাফর।

মিড শট : শশাংক সংলাপ বলছে : "ক্ষমা! ক্ষমা আমি তোমাকে কোন দিনই করতে মীরজাফর; তোমাদের কাউকেই না, আর শুধু আমি কেন পাঁচশ বছর পরের পারব না দেশের মানুষ তোমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না, কারণ তারা জানবে তোমাদের বিশ্বাস করে আমি শুধুই পেয়েছিলাম বিশ্বাসঘাতকতা। অবশেষে একা আমি আজ নিঃস্ব, রিক্ত, মহাশ্মশানের চিতা ভস্মে যা কিছু পড়ে রইল, তা শুধুই হতাশা, বঞ্চনা আর দীর্ঘশ্বাসের রক্তাক্ত···"

সংলাপ বলতে বলতে শশাংক ঘুরে তাকায় সহসা। বাজনা থেমে যায়।

লং শট : পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়ে গিয়ে আগুন ধরে গ্যাছে কয়েকটা জায়গায়। শশাংকের মুখে ছায়া কাঁপছে সেই আগুনের। লোকজন ছুটে পালাচ্ছে কিছুটা ত্রাসে। চিৎকার, বাজনাদারদের দৌড় ইত্যাদির দৃশ্য।

লং শট : মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে একা শশাংক। সে দেখছে।

মিড শট : রাগ ও অভিমানের ছায়া পড়েছে তার মুখে।
লং শট : শশাংক একা দাঁড়িয়ে আছে।
আবহে আবহসংগীত বাজছে।

দৃশ্য ২ : রাত্রি

Make-Shift arrangement-এর মতো একটা মেকাপ রুম। ছোট-বড় আয়না নিয়ে বসে কয়েকজন যাত্রা দলের লোক মেকাপ তুলছে। মিড শটে ক্যামেরা আস্তে আস্তে প্যান করে আসে শশাংকর ওপর। মাঝারি গোছের একটা আয়নার সামনে বসে আছে শশাংক। কিছুটা অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ তার মুখ। দলের লোকজনদের টুকরো টুকরো কথা শোনা যায়।

সরল ॥ বাপের জন্মে এরকম দেখিনি। শালার পাবলিকের দৌড়টা দেখলি! যেন ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে!

অন্য একজন ॥ ঠিক ভাবছিলুম। একটা কিছু হবে আজ, সক্কালবেলা কি হোলো, ছেলেটাকে কাঁধে নিলুম, বানচোদ দিলো আমার গায়ে মুতে। মেজাজটা সেই যে বিগড়ালো আর শেষে ছাথ এই!

দ্বিতীয়জন ॥ বাচ্চাকে না নিয়ে বাচ্চার মাকে কাঁধে নিলে পারতে দাদা। দিনটা অন্যভাবে কাটতো। [এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে]

ক্যামেরা এইসব কথাবার্তার মাঝখানেই শশাংককে ছেড়ে টিল্টআপ করে তার মুখের প্রতিবিম্বের দিকে এগিয়ে যায়। Off voice শোনা যায় (শশাংকদা বাস রেডি)

cut to

দৃশ্য ৩ : রাত্রি ভোর হয়ে আসছে

মিড শট : একটা বাসের ভেতর। বাসের ভেতর থেকে লং শটে একটা ট্রেন দেখা যায়। একটু জোরেই যাচ্ছে ট্রেনটা। বাসের ভেতরের লোকজন ঢুলছে ঘুমে, আধঘুমে। শশাংক বসে আছে একটা জানলার সামনে। সে জেগে আছে। পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে। প্যাকেটটা খালি। ফেলে দেয় জানলা দিয়ে।

ভূপতি দলের ম্যানেজার, উঠে এসে একটা প্যাকেট মেলে ধরে।

ভূপতি ॥ দাদা।

শশাংক তাকায়, তারপর একটা সিগারেট তুলে নেয়।

ভূপতি ॥ এই যে এই যে দেশলাই। ভূপতি দেশলাই জালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়।

ভূপতি ॥ নতুন বই-এর রিহার্সাল তো শিগগিরই শুরু হবে শুনলাম। দত্তমশাই বলছিলেন। জানেন তো?

শশাংক ॥ না।

জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা ছোট ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। নিচে ছোট কুন্তি নদী, কয়েকটা নৌকা। পেরিয়ে যায় এই দৃশ্য।

ভূপতি ॥ এবারের পালাও তো দাদা আপনার, নাকি?

শশাংক ॥ জানি না।

ভূপতি ॥ [তোষামোদের ভঙ্গিতে] হতেই হবে! শুনলাম তো লেখা প্রায় শেষ! আপনার নামে তবু কিছু লোক আসে।

[শশাংক জানলার দিকে তাকায়]

লং শটে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়।

ভূপতি ॥ তা না হলে ছোট টাউনের এসব দল পৌঁছে কে। বুকিং কৈ? আজ মাসের সাত তারিখ। গত মাসের মাইনেটাও এখনো পাইনি।

সরল উঠে শশাংকর পাশে বসে। ক্যামেরা জুম করে। সরল তাকায় শশাংকর দিকে। শশাংক বাইরে তাকিয়ে আছে। সরল ভূপতিকে বলে—

"যেন আমরা পেয়েছি। দাও, একটা সিগারেট দাও।"

ভূপতি সিগারেটের প্যাকেটটা অনিচ্ছায় বের করে বলে—"আমাকে কেন, দত্ত মশাইকে বলো।"

সরল দুটো সিগারেট বের করে নিতে নিতে বলে—"একটা ধার"।

ভূপতি ॥ আঃ!

সিগারেট জালিয়ে নিয়ে সরল বলে, "আমার বলার দরকার নেই। আমি দল ছেড়ে দিচ্ছি।"

শশাংক তাকায়

লো অ্যাঙ্গেল মিড শট : সরল একটু ইতস্তত করে বলে—"হ্যাঁ দাদা, আপনি যতদিন চালিয়েছিলেন ততদিন তবু চলে গ্যাছে। নাহলে এই শালার চন্দ্র নাট্য কোম্পানি অনেক আগেই ছেড়ে···

[বলেই জিভ কাটে]

মিড শট :

শশাংক ॥ মুখ সামলে কথা বল সরল। আমার বাবার নামে এই দল। যতদিন সাধ্য ছিলো, নিজের পয়সায় ভালবেসে চালিয়েছি। এখন দল মণ্টু দত্তর জিম্মায়।

মিড শট :

সরল ॥ তোমার জমিদারী ছিল !

মিড শট :

শশাংক ॥ ছিল, এখন নেই। অভিনয় ভালবাসি, তাই এখনো আছি। কিন্তু ভালো কিছু এখন আর লোকে চায় না। সবাই খিস্তি খেউড় চায়, মেয়েছেলের নাচ দেখতে চায়।

লো অ্যাঙ্গেল মিড শট :

সরল ॥ আমি কোলকাতা চলে যাচ্ছি। ফাইনাল। মেঘনাদ অপেরার সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে। মাস গেলে তবুতো কিছু টাকা আসবে। খিস্তি বলো খেউড় বলো, যা করতে বলে করে দেবো। পেটটা তো বাঁচবে !

মিড শট : [প্রেফারেন্স সরল]

শশাংক ॥ এসব কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছিস্ ! যে যা ভাল বুঝিস তাই করবি। দল আগেই ভাঙতো আমি তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। কোলকাতা পার্টির মতো দল চালাবে বলে, পয়সা করবে বলে মণ্টু দত্ত দলটা নিল। এবার না হয় আবার ভাঙবে।

কম্পোজিট শট : [প্রেফারেন্স শশাংক]

সরল। তোমার এমন প্রতিভা। যেমন লেখা তেমন এ্যকটিং ! দুজনে মিলে একবার দেখিয়ে দিই শহরের লোকগুলোকে। তোমার তো কোন পিছু টান নেই।

[শশাংক জানলার দিকে মুখ ফেরায়।]

মিড শট :

শশাংক ॥ না। বড় শহর বেশী নোংরা। মানুষ ওখানে তাড়াতাড়ি পচে। আর, আমার তো চলে যাচ্ছে।

cut to

দৃশ্য ৪ : ভোরবেলা

লং শট :

একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে চড়ে শশাংক আসছে। দুপাশে ভেঙে পড়া

পুরোনো বড় বড় বাড়ী। অল্প লোকজন রাস্তায়। দু'একজন হাত নাড়ে। কেউ নমস্কার করে।

লং শটে দূর থেকে ধরে : আম বাগানের মধ্য দিয়ে আসছে শশাংকর গাড়ী। দুপাশে গাছ। শব্দ হচ্ছে হাওয়ায় পাতাদের নড়ে ওঠার। ছেঁড়া ছাতা বগলে নিয়ে একজন রোগা আধবুড়ো লোক শশাংককে দেখে হাতজোড় করে মাথা নিচু করে প্রণাম করে। শশাংক হাতটা কপালের কাছাকাছি তোলে প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে। গাছে কুড়াল চালানোর ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যায়। শব্দটা বাড়ছে। শশাংক গাড়ী থেকে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর গাড়ী থামাতে বলে। গাড়ী থেকে নেমে শশাংক গাছগুলির মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। শুকনো পাতায় শশাংকর পায়ের শব্দ। শশাংক চারপাশে তাকায়। গাছ কাটার শব্দ থেমে যায় সহসা। গাছের ভেতর দিয়ে দু'তিনজন লোক খালি গায়ে ছুটে যাচ্ছে।

শশাংক ॥ (অফভয়েস) এই দাঁড়া তো।

মিড শট : শশাংক গাড়ী থেকে নামে।

লং শট :

শশাংক ॥ [চিৎকার করে] দাঁড়া। দাঁড়া বলছি। কতদিন বারণ করেছি ! শুনবি না। এবার পুলিশে দেবো।

একটা গাছের দিকে এগিয়ে যায় শশাংক। ক্লোজ আপ : গাছটার গুঁড়িতে কোদালের দাগ। শশাংক সে জায়গায় হাত বোলায়। গাছের কষ পড়ছে সেখান দিয়ে। ভাঙা গাছের ছাল দিয়ে সে জায়গাটা জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করে। জোড় থাকে না। শশাংক উঠে দাঁড়ায়। বিগ ক্লোজ আপ : চেনা মানুষের মতো হাত বোলায় সে গাছের গায়ে। গাছের চারপাশে ঘোরে। পিঁপড়ের সারি গাছের গায়ে। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে শশাংক। ক্যামেরা জুম-ব্যাক করে।

cut to

দৃশ্য ৫ : ভোরবেলা, আলো বেড়েছে।

দু'জন পালোয়ান ল্যাঙোট পরে কুস্তি লড়ছে। প্রাণপণ লড়াইয়ের ভঙ্গি তাদের। লং শট : একটু দূরে শশাংকর গাড়ী এসে থামে। শশাংক এগিয়ে আসে ব্যাগ নিয়ে ভাড়া মিটিয়ে। পালোয়ানরা শশাংককে দেখে লড়ার বেগ বাড়িয়ে দেয়। শশাংক সামনে এসে দাঁড়ায়। কুস্তি দেখতে থাকে। তার মুখের শান্ত কোমল

ভাব আস্তে আস্তে সরে গিয়ে জাগে এক কাঠিন্যের ছাপ। সেই কাঠিন্যের মধ্যেই ফুটে ওঠে সামনের কুস্তির দৃশ্য উপভোগের চিহ্ন। পালোয়ানদের একজন আর একজনকে উল্টে ফেলে দেয় মাটিতে। মাটি থেকে উঠতে উঠতে—

পালোয়ান ॥ আইয়ে বাবু, আইয়ে ··

শশাংক ॥ আজ থাক। জলটল কিছু দিয়েছে।

পালোয়ান ॥ হ্যাঁ। সরবৎ মিলা। আপনি না থাকলে বাবু জামতা নেহি।

শশাংক ॥ কেন ?

পালোয়ান ॥ লড়নে মে জিদ নেই আতা। আপ হ্যায়, ইসলিয়ে লড়তা হ্যায়। শশাংক হাসে।

লং শট : কুস্তি চলছে।

হাই অ্যাঙ্গেল শট : বাড়ীর ভেতর ঢুকছে শশাংক। ২০০-২৫০ বছরের পুরোনো বাড়ী। প্রায় জমিদার বাড়ীর মতো। একটা দালান পেরিয়ে বড় উঠোন, তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে শশাংক। পায়রার আওয়াজ শোনা যায়। লং শট : মাথার ওপরের সিঁড়ির জানলা দিয়ে উড়ে যায় পায়রা। শশাংক ব্যাগ নামিয়ে রেখে ডাকে।

মিড শট :

শশাংক ॥ রাশু।

ক্যামেরায়, বারান্দা। চাতাল, বাড়ীর অন্য দু-একটা অংশ। শশাংকর গলা শোনা যায়,

শশাংক ॥ রাশু।

দেখা যায় নিচের বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে শশাংক।

তারপর রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা বন্ধ। খুলে ছাখে কেউ নেই। পাশের আর একটা ঘর থেকে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। শশাংক তাকায়। তারপর এগিয়ে যায় সেই ঘরের দিকে। মিড শট : শশাংক দরজা ঠ্যালে। ভেতরের থেকে বন্ধ। শশাংক ধাক্কা দেয় দরজায়। একটু পরে দরজা খোলার খুট শব্দ শোনা যায়। শশাংক ডাকে।

শশাংক ॥ কে তুই ?

কোন শব্দ নেই। হাত দিয়ে ঠেলে দরজার পাল্লা খুলে দেয় শশাংক।

ঘরের ভেতরে কতগুলো বেড়ালের সঙ্গে একটা মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দেখতে স্বাভাবিক নয়। মুখ দেখলে বোঝা যায় গরীব, জড় ও ভ্যাবলা। শশাংক

অবাক হয়। তার মুখে বিস্ময় ও পাশাপাশি অল্প বিরক্তি ফুটে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে, "কে তুই ?" মেয়েটি তাকায়। উত্তর দেয় না। ভয়ে আরো একটু কোণে সরে যায়।

শশাংক আবার জিজ্ঞাসা করে, "এখানে কি করছিস।"

কোন উত্তর নেই। মেয়েটা হঠাৎ উঠে শশাংককে ঠেলে ছুটে পালায়।

লং শট : শশাংক ছাখে মেয়েটা বারান্দা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মেয়েটি। রাশু আসছে। মেয়েটি তার পাশ দিয়ে ছুটে যায়। রাশু মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। তারপর ডাকে, "এ্যাই কল্যাণী, কি হল ?"

কল্যাণী একটু দূরে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। রাশু কল্যাণীকে ছাখে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে তাকায়।

লং শট :

দূরে সেই ঘরটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শশাংক।

cut to

দৃশ্য ৬ : দুপুর

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংক দাবা খেলছে।

লং শট : শশাংক বারান্দায় হাঁটছে।

মিড শট : দাঁড়িয়ে আছে শশাংক।

মিড শট : শশাংক যাত্রাপালা লিখছে।

টিল্ট-ডাউন : শশাংকর ঘর। খাটে শশাংক ঘুমিয়ে আছে।

লং শট : সাইকেলে করে পিওন আসছে শশাংকর বাড়ীর রাস্তা দিয়ে। সদর দরজা পেরিয়ে চলে গিয়ে হঠাৎ থামে। তারপর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এসে সদর দরজার কাছে থামে। সাইকেল থেকে নেমে সদর দরজার সামনে লাগানো একটা পুরোনো, প্রায় ভাঙা লেটারবক্সের ভেতরে একটা খাম ঢুকিয়ে ছ্যায় তাড়াতাড়িতে।

লেটার বক্সটার তলার কাঠ ফাটা বা কাঠ নেই ; খামটা নিচে পড়ে যায়।

পিওন লক্ষ্য না করে সাইকেলে চড়ে উধাও হয়ে যায়। ক্যামেরা মাটিতে পড়ে থাকা খামটিকে ধরে। ঠিকানায় লেখা—শ্রীযুক্ত শশাংকশেখর সেন, বন্দিপুর, জানবাজার, পশ্চিমবঙ্গ।

ক্যামেরা টিল্ট-আপ করে। অল্প অল্প কাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শশাংক খাটে পাশ ফেরে।

cut to

দৃশ্য ৭ : সন্ধ্যা

মিড শট : শ্বেত পাথরের টেবিলে একটা গ্লাসে মদ ঢালছে শশাংক। পাশে রেকাবিতে একটু চানাচুর। একটা দম দেওয়া গ্রামোফোনে পুরোনো ঠুংরি বাজছে। হাত নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছে শশাংক। তার মুখ দেখে বোঝা যায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে খাচ্ছে। off voice-এ রাশুর গলার গান শোনা যায়। ক্যামেরা ট্রলি ব্যাক করে ঘরের বাইরে চলে আসে। দেখা যায় দরজার বাঁদিক ঘেঁসে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটু তুলে বসে আছে রাশু। রাশুও মদ খাচ্ছে। শালপাতায় চানাচুর। লং শট (প্রেফারেন্স : রাশু) : দরজা দিয়ে ভেতরে শশাংককে দেখা যায়। রাশু গাইতে গাইতে তার গ্লাসের শেষ মদটুকু এক ঢোকে খেয়ে ফ্যালে। মুখ চোখ কুঁচকে। তারপর বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে মুখটা মুছে নেয়। একটু থেমে শশাংকর উদ্দেশ্যে বলে—"বাবু, বাবু, রাত হয়ে গ্যাছে। খেয়ে নিন।"

মিড শট :

শশাংক ॥ ওই মেয়েটা কে ?

রাশু ॥ কল্যাণী।

শশাংক ॥ কে কল্যাণী ?

রাশু ॥ ওই।

শশাংক ॥ তুই শালা একটা ক-অক্ষর গোমাংস।

রাশু ॥ (off voice) কেন ? লেখাপড়া শিখে কি হয় বাবু এই তো দিব্যি বেঁচে আছি।

মিড শট :

শশাংক ॥ তুই জানিস তুই কেন বেঁচে আছিস ?

লং শট :

রাশু ॥ না বাবু। আমারও প্রত্যেক সকালবেলা তাই মনে হয়। নিজেকে শুধোই, এই রাশু কেন বেঁচে আছিস রে ?

মিড শট : শশাংক গম্ভীর। একটু পরে সে কথা বলে —

শশাংক ॥ এ্যাই আমি কেন অভিনয় করি, কেন পালা লিখি তুই জানিস ?

মিড শট : রাশু মদ খায়, কোন উত্তর দেয় না।

ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ আমরা যে গ্রহটায় থাকি তার নাম জানিস ?

মিড শট :

রাশু ॥ জান বাজার।

ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ ধ্যেৎ, দুর শালা।

মিড শট :

শশাংক ॥ গ্রহটার নাম পৃথিবী। এর একটা ইতিহাস আছে (শশাংকের পেছনে বারান্দা দেখা যায়)। একটা ওঠা পড়া আছে। গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, সোফোক্লিস, শেক্সপিয়র, কতো নাম। সিরাজদৌল্লা, শের আফগান, কি সব জীবন! সেই জীবন আমাকে হাতছানি দেয়, আমাকে ডাকে। আমি সেই সব লিখি, পালা করে তাঁদের কথা বলি। প্রত্যেকটা জীবনের একটা দিক আছে, একটা গতি আছে ? গতি বুঝিস ? গতি ?

মিড শট :

রাশু ॥ (ব্যাকগ্রাউণ্ডে শশাংককে দেখা যায়) বাপ যখন আমাকে ছোট রেখে মরে গেল মা-মনসার কামড়ে। আমাকে বলে গেল "রাশু তোর কোন গতি করতি পারলাম না। সেই ছাখেন সেই বাপের কথা তো সত্যি হোলো। আমার গতি হোলো না, কেন ?

মিড শট : শশাংক চুপ করে থাকে। মদে ঢোক গেলে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় রাশু তার কথা কিছুই বুঝছে না। একটু পরে—

শশাংক ॥ আমি তোর সঙ্গে মদ খাই, কথা বলি, কেন রে ?

মিড শট :

রাশু ॥ আপনার একা লাগে তাই।

মিড শট : (কেন্দ্র : রাশু)

শশাংক ॥ তুই কোলকাতা যাবি ? আমার জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই গেছে, তুইও চলে যা।

রাশু ॥ আমার কোথাও যাওয়ার নাই বাবু, ওই কল্যাণীরে···?

মিড শট :

শশাংক ॥ কে কল্যাণী ? কোন শালা কল্যাণী ? সব শালা ছাইপাঁশ, ইতিহাস ছাইপাঁশ, বেঁচে থাকা ছাইপাঁশ। সব সম্পর্ক ছাইপাঁশ, এখানকার মানুষ শালা বেড়ালের মতো খালি শালা কাঁটা চিবোয়। আমার একটা বউ ছিলো খালি কাঁটা চিবোতো। আমার বউটা পালিয়ে গেল কেন রে ?

মিড শট :

রাশু ॥ আমি জানি না বাবু।

শশাংক ॥ চুপ শালা, (শশাংক হেঁটে বেরিয়ে আসে) তুই শালা জানিস। তুই শালা সব বুঝিস।

শশাংক মদের গ্লাসের মদটুকু খেয়ে নিয়ে আবার মদ ঢালে।

মিড শট :

রাশু ॥ আপনার একটা চিঠি এসেছে আজ। তলায় আছে।

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংক তাকায়, শশাংকর দুটো হাত একটা খাম ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা বের করে।

বিগ ক্লোজ আপ : চিঠিতে লেখা—

"ভাই শশাংক,

এতদিন পর হঠাৎই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হবে। লেখার তো আর মুখ নেই। আমার বোন যমুনা সকলের মুখে কালি দিয়ে গেছে। তবে আমার চক্ষুলজ্জার সময় এখন নয়। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কানাই-এর বাবা মাস ছয় হোলো গত হয়েছেন। আমার এই নিঃসহায় অবস্থায় তোমার কথা মনে হলো। যদি কিছু করতে পারো। আর কি। ইতি—সরযূদি।

Back to Camera প্রায় পর্দা জোড়া চিঠিটা আস্তে আস্তে নেমে আসতে থাকে,

বিগ ক্লোজ আপ : সামনে শশাংকর মুখ দেখা যায়। শশাংকর মুখ ভারী ও গম্ভীর এবং হঠাৎ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শশাংক পুরোনো একটা এ্যালবাম বের করে আনে। দ্রুত পাতা ওল্টায়। একটা পাতায় সরযূর ছবি। উল্টে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনে সেই পাতা। পাশের পাতায় যমুনার ছবি। ক্যামেরা যমুনার ছবির দিকে আস্তে আস্তে চার্জ করে। শশাংকর মুখ—রাগ ও অপমানে পৃথক হয়ে উঠছে সেই মুখ।

বিগ ক্লোজ আপ : পর্দায় একটার পর একটা dissolve করে ভেসে ওঠে যমুনা ও শশাংক এবং যমুনার তিন-চারটে ছবি। শেষ ছবিটিতে দেখা যায় যমুনা ও

শশাংক দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছে। ছবির রং Black and White এবং dissolve শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ···

ফ্ল্যাশ ব্যাক : দিন।

বারান্দা দিয়ে বাবলু এগিয়ে আসছে শশাংক ও যমুনার ঘরের দিকে।

মিড শট : ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে—"দাদা"। ভেতর থেকে যমুনার পায়ের শব্দ শোনা যায়। যমুনা দরজা খুলে দেয়।

কম্পোজিট শট : যমুনা তাকায় বাবলুর মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে। বাবলু ও তাকায়, বলে—"আছে ?"

যমুনা তাকায় ঘরের ভেতর। শশাংক লিখছে।

লং শট : শশাংক লিখতে লিখতে বলে—"কি দরকার ?"

বাবলু এগিয়ে আসে। টেবিলের ওপর একটা টাকার বাণ্ডিল রাখে।

মিড শট : শশাংক লিখতে লিখতে বলে—"কিসের ?"

কম্পোজিট শট :

বাবলু ॥ দীঘির কাছের ওই জঙ্গল বিক্রির বায়নার টাকাটা। কুণ্ডুরা দিয়ে গেছে, পাঁচ হাজার আছে।

শশাংক লেখা বন্ধ করে তাকায় বাবলুর দিকে। তারপর টাকাটার দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। চশমাটা খুলে তারপর আবার লিখতে শুরু করে।

লো অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আপ :

বাবলু ॥ পঞ্চাশে রাজি হচ্ছে না। ঐ চল্লিশ হাজারই দেবে।

মিড শট : শশাংক "হুঁ" বলে আবার লিখতে শুরু করে। বাবলু যায় না। শশাংক লিখতে লিখতে বলে—"আর কিছু।"

লো অ্যাঙ্গেল ক্লোজ আপ :

বাবলু ॥ কুণ্ডুরা বলেছিলো ওদের কোলকাতায় ভালো পার্টি আছে। বাড়ীটা বেচতে চাইলে ভালো দাম দেবে। কথা বলে দেখবেন একবার ? পেছনের দিকটাতো একেবারে ভেঙে পড়েছে। ওরা কি একটা গুদাম বানাবে বলছিলো।

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখে অসম্ভব রাগ ফুটে ওঠে। তাকায় সে বাবলুর দিকে। বাবলু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে।

রিয়্যাকশন শট : যমুনা।

মিড শট :

শশাংক ॥ শোন্, কুণ্ডুদের বলে দিস টাকা হলেই জাতে ওঠা যায় না। ওটা রক্তের ব্যাপার।

শশাংক লিখতে থাকে। বাবলু চলে যায়। যাওয়ার আগে তাকায় একবার যমুনার দিকে। যমুনা শশাংকর দিকে তাকায়। ক্লোজ আপ : যমুনা এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বারান্দায় ছাখে বাবলু চ'লে যাচ্ছে।

মিড শট : যমুনা সরে এসে পায়ের মল বাজায় কয়েকবার, শশাংকর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে। ক্লোজ আপ : যমুনা খাটে উঠে বসে। উপুড় হয়ে শোয়।

মিড শট : যমুনা গান গায়—"পৃথিবী আমারে চায়"

যমুনা গান গাইতে গাইতে পা তোলে, ক্যামেরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্যান করে।

মিড শট : শশাংক বিরক্ত চোখে তাকায়। বলে—"কি হচ্ছে যমুনা ?" যমুনা গান থামায়।

যমুনা ॥ আমাকে সিনেমা নিয়ে যাবে আজ ?

শশাংক ॥ এটা শেষ না করে উঠছি না। মহড়ার দিন এসে গ্যাছে।

মিড শট :

যমুনা ॥ কি লেখ ছাইপাশ।

মিড শট :

শশাংক ॥ ছাইপাশ ?

মিড শট :

যমুনা ॥ না তো কি ? কি হয় পালা লিখে ? এর চেয়ে নভেল লিখতে পারো। ছাপা করাতে পারো কোলকাতায়।

শশাংক আর কথা না বাড়িয়ে লিখতে থাকে। যমুনা উঠে বসে, নামে খাট থেকে। একটু এদিক ওদিকে হাঁটে ঘরের ভেতর। তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মিড শট :

যমুনা ॥ দাওনা গো বেচে বাড়ীটা ? কোলকাতায় চলে যাই আমরা।

লং শট :

শশাংক ॥ [লিখতে লিখতে বলে] যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না।

যমুনা মুখ দিয়ে "ছঁ" শব্দ করে।

যমুনা নিচে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। মল-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে। যমুনা নিচের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

cut to

বাবলুর ঘর। বাবলুর মুখ উত্তেজিত। টাকার কয়েকটি নোট গুনছে। দরজা খুলে যায়। বাবলু চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দ্রুত টাকাটা জামার পকেটে রেখে দেয়। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা। যমুনা হাসে।

কম্পোজিট শট :

বাবলু ॥ হাসছো কেন ?

যমুনা ॥ [হাসি না থামিয়ে বলে] দেখে যেভাবে চমকে উঠলে···ভূত নাকি আমি ? [হাসতে থাকে যমুনা]

বাবলু ॥ যাঃ···

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখ। লিখছে। নিচের থেকে কিছুটা ক্ষীণভাবে যমুনার হাসির শব্দ শোনা যায়। শশাংক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হাসির শব্দ আস্তে আস্তে পায়ের মলের শব্দর সঙ্গে মিশে যায়।

দ্বিতীয় ফ্ল্যাশ ব্যাক—রাত্রি।

বিগ ক্লোজ আপ : যমুনার মল পরা দুটি পা। খাটে দেখা যায় Back to Camera মুখ করে শুয়ে আছে শশাংক। যমুনা পেছন ফিরে তাকায় ঘুমন্ত শশাংকর দিকে। আবার পা ফেলে। মল-এর শব্দ বাড়ে। যমুনা পা-এর দিকে তাকায়। তারপর শশাংকর দিকে। তারপর মাথা নামিয়ে এসে নিচে মলজোড়া খুলে ফেলে দুপা থেকে। ক্যামেরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে নিচে। মলজোড়া মাটিতে পড়ে থাকে। যমুনার পা এগিয়ে এসে frame-out হয়ে যায়। খুট করে দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়।

মিড শট : শশাংকর মুখ fore ground-এ খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে! দেখা যায় যমুনা পেছনে, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দেয় যমুনা। দরজা খোলা ও ভেজানোর দীর্ঘ 'ক্যাচ' শব্দ শোনা যায়। শশাংকর চোখ খুলে যায় এই শব্দে। মৃদু নাক ডাকার শব্দও থেমে যায়।

মিড শট : শশাংক পাশে যমুনার জায়গায় তাকায়। উঠে বসে। দৃষ্টি যায় মাটিতে খুলে রাখা যমুনার মলজোড়া ও ভেজানো দরজার দিকে।

লো অ্যাঙ্গেল শট : কিছুটা ছুটে প্রায় অন্ধকার বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে যমুনা।
হাই অ্যাঙ্গেল শট : দূরের একটা ঘরের আলো জলে ওঠে।
যমুনা ছুটে যেতে যেতে তড়িৎ গতিতে ফিরে তাকায়। সামনের আলো জলে ওঠা ঘর থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে আসে একজন।
লং শট : সে যমুনার হাত ধরে তাকে টেনে নিচের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে থাকে।
বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে শশাংকও সেই দিকে ছোটে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামে। দাঁড়ায়। ওদের দেখার চেষ্টা করে। আধো-অন্ধকার, চারদিক খুব স্পষ্ট নয়। পায়ের শব্দ শুনে সদরের দিকে ছুটে যায়। কেউ নেই ওদিকে। শশাংক আবার দাঁড়ায়। হাঁপায়।
কোন সাড়া নেই।
লং শট : দূরে একটা দরজা দিয়ে তারা ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। শশাংক ডাকতে গিয়ে থেমে যায়। বাইরে পূর্ণিমার আলোয় দেখা যায় যমুনা ও বাবলু ছুটে পালাচ্ছে। তাদের মুখ, তারা পালাচ্ছে। দূরে বাড়ীর দরজার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে শশাংক। ছায়ার মতন।
বিগ ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখ। অপমানিত, ক্রুদ্ধ বা সহসা যেন এক আঘাতে আক্রান্ত।
ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ।
গ্লাসের অবশিষ্ট মদ এক চুমুকে শেষ করে ঠক করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখে শশাংক। শশাংকর মুখে অপমান, ক্রোধ, বেদনা সব একসঙ্গে এখনো ছায়া ফেলে আছে।

cut to

রাশু দেওয়ালে ঐ ভাবে বসে আছে। ঝিমোতে ঝিমোতে জড়ানো গলায় বিড় বিড় করে গান গাইছে—সাঁইয়া, সাঁইয়া···
অনেকটা রেকর্ডে চালানো ঠুংরি সুরের নকল করে। ভেতর থেকে শশাংকর গলা শোনা যায়।
—"সাঁইয়া সাঁইয়া মেরি"।
মিড শট :
শশাংক ॥ রাশু। এই শালা রাশু।
রাশু ॥ হুঁ।

শশাংক ॥ বোতল বার কর।
রাশু ॥ আর বোতল নেই।
শশাংক ॥ নেই মানে ? খেলো কে ?
[রাশু উত্তর দেয় না। শশাংক চিৎকার করে ওঠে 'এই শালা রাশু' ?]
রাশু ॥ আপনার আর আমার দুই বাপ।
লং শট : শশাংক গ্লাসটা ছুঁড়ে দেয়, ভেঙে ছড়িয়ে যায় রাশুর সামনে, বারান্দায়।

cut to

দৃশ্য ৮ : বেলার দিক

পোস্ট অফিস। কাউন্টারের সামনে শশাংক। হাতে কিছু টাকা ও ফর্ম ধরা। ভেতরে একটা লোক খাম, পোস্টকার্ডের ওপর ধপ ধপ করে স্ট্যাম্প মেরে যাচ্ছে। আওয়াজ হচ্ছে তার।
বিগ ক্লোজ আপ : শশাংক ফর্মের তলার জায়গায় কোন সম্বোধন ছাড়াই লিখছে "আপনার চিঠি পেয়েছি। ১০০ টাকা পাঠালাম। ছেলে সহ আমার কাছে এসে থাকলে আমার পিসিমার দেখাশুনো করতে পারেন। আসতে চাইলে জানাবেন। অত্র মঙ্গল।
ইতি— শ্রীশশাংকশেখর সেন।
ক্লোজ আপ : লিখে ফর্মটা টাকা সমেত কাউন্টারে হাত দিয়ে গলিয়ে দেয়। পোস্ট অফিসের লোক টাকা দ্রুত গুনে ফর্মে শীল মারে ধপ করে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে শশাংকর মুখ।
লং শট : ট্রেন আসছে।
ক্যামেরা স্থির হয়ে আছে।
লো অ্যাঙ্গেল শট : সরযূ ছেলে সহ ট্রেন থেকে নামে।

লং শট : সরযূ, তার ছেলে কানু ও শশাংক ঘোড়ার গাড়িতে করে আসে।

দৃশ্য ৯ : দিন

শশাংক ॥ রাশু, রাশু।
রাশু ॥ আমারে ছ্যান।
লং শট : বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শশাংক। পেছনে রাশু সরযূদের জিনিসপত্র

নিয়ে। তার পেছনে সরযূ ও সবশেষে কানাই বা কানু। কানাই-এর চোখে বিস্ময়। সে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। একটা ঘরের দরজা খুলে দেয় শশাংক। হাই অ্যাঙ্গেল লং শট : সরযূ শশাংকর দিকে তাকায়।

ঘরটা আগে দেখা গেছে। এটা যমুনা ও শশাংকর ঘর। ঘরে দেখা যায় সব জিনিসপত্র ঠিক আগেকার মত করে রাখা। মিড শট : দেওয়ালে যমুনার ছবি।

লো অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ আপনারা থাকবেন। আপনার বোনের ঘর এটা। সব আছে ব্যবহার করবেন। ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা পুকুর দেখা যায়।

[সরযূ চারদিক তাকায় ঘরের ভেতর। বোঝা যায় সে বুঝতে পেরেছে। খাট, পালংক, আলমারি, ছবি সব দেখে। তার মুখে আপত্তি ফুটে ওঠে]।

মিডশট :

কানু ॥ মা, কত পায়রা দেখবে এসো।

[শশাংক তাকায়,]

ক্লোজ আপ :

সরযূ ॥ আমাদের অন্য ঘরে জায়গা করে দাও। নিচের কোন ঘরেও দিতে পারো।

[সরযূ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মালপত্র নিয়ে অন্য একটা ঘরের দিকে চলেছে রাশু। লং শট : শশাংক আর একটা ঘরের তালা খোলে। রাশু সেখানে জিনিস-পত্র রাখে।]

লংশট (প্রেফারেন্স : সরযূ) :

শশাংক ॥ বাড়ীর চাবি। আপনার কাছে থাক।

সরযূ ॥ তোমার পিসিমা ?

শশাংক কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে টানা বারান্দায়। সরযূ এগিয়ে যায়। দরজার সামনে—

কম্পোজিট শট :

সরযূ ॥ বললে না তো, তোমার পিসিমা ?

সরযূর চোখে সন্দেহ। শশাংক যেতে যেতে থামে। সরযূর দিকে না তাকিয়েই—

কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : শশাংক) :

শশাংক ॥ এ বাড়ীতে শুধু রাশু আর আমি থাকি।

সরযূ ॥ মানে ?

শশাংক ॥ আমার কোন পিসিমা নেই।

সরযূ ॥ [আহত অবস্থায়] তবে লিখেছিলে কেন ?

কম্পোজিট শট : (প্রেফারেন্স : সরযূ) : শশাংক সরযূর দিকে তাকায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে এনে আবার হাঁটতে শুরু করে। (পেছন থেকে সরযূ)

সরযূ ॥ তোমার স্বভাব চরিত্র এতটুকু বদলায়নি।

শশাংক দাঁড়ায়। অল্প হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে।

শশাংক ॥ শুধু বৌ আর বয়সটা ধরে রাখতে পারিনি। এছাড়া নাটক, কুস্তি, মদ, সবই বজায় আছে।

শশাংক চলে যায়। ক্যামেরা এগিয়ে যায় সরযূর মুখের দিকে। সরযূ আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় ছেলের দিকে। কম্পোজিট শট : কানাই জানলার দিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে গান গাইছে

"হও ধরমেতে ধীর
হও উন্নত শির···
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান
হবে জয়।"

(ক্যামেরা জুম ফরোয়ার্ড করে কানাইকে বিগ ক্লোজআপে ধরে।)

সরযূর মুখ। চোখের তারার ওপরে জল চিক্ চিক্ করছে। ক্যামেরা তাকে আস্তে আস্তে চার্জ করে মিড ক্লোজে ধরে। কানাই-এর গান শোনা যাচ্ছে।

cut to

দৃশ্য ১০ : সকাল

বারান্দায় আয়নার সামনে বসে দাড়ি কাটছে শশাংক। আয়নায় দেখা যায় পেছনের ভেজানো দরজার একটা পাট খুলে যাচ্ছে। সরযূকে দরজার বাইরে দেখা যায়। শশাংক মুখ ফেরায়। চোখে জিজ্ঞাসা। সরযূ চাবিটা বাড়িয়ে দেয়।

সরযূ ॥ এটা লাগবে না।

মিড শট :

শশাংক ॥ [একটু থেমে বলে] এখন এটাই আপনার বাড়ী আপনি এখানে বেড়াতে আসেন নি।

সরযূ ॥ ভাবছি, কেন এলাম !

শশাংকর মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

মিড শট :

শশাংক ॥ কেন এসেছেন তা আপনিও জানেন। আমিও জানি।

সরযূ (off voice) ॥ কি বলতে চাও তুমি ?

শশাংক ॥ ছেলেকে মানুষ করাটা আপনার কাছে খুবই জরুরী।

মিড শট :

সরযূ ॥ তুমি ভেবো না আমি শুধু তোমাকেই চিঠি লিখেছিলাম। আমার ভাসুর দেওর এখনো আছে।

শশাংক ॥ কিন্তু কেউই দায়িত্ব নিতে চায়নি। শুধু শুধু মোট বইতে কেউই চায় না।

মিড শট :

সরযূ ॥ কি ভাবো তুমি আমাকে ?

মিড শট :

শশাংক ॥ আমার চরিত্র খারাপ। কোন একসময় আপনার সম্পর্কে আমার দুর্বলতা ছিল। সবই আপনি জানতেন। তবু চিঠি লিখেছিলেন কেন ?

সরযূ উত্তর দেয় না। সরযূ অন্যদিকে মুখ ফেরায়। তার মুখ দেখে বোঝা যায় সে ধরা পড়ে গেছে শশাংকর কাছে। ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে আস্তে আস্তে তার মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

বিগ ক্লোজ আপ : সরযূর মুখ।

শশাংকর গলা শোনা যায়—চাবিটা আপনার কাছে থাক (off voice)।

cut to

দৃশ্য ১১ : দুপুর

লো অ্যাঙ্গেল শট : একটা দরজা খুলে যায়।

শশাংকদের ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ীর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কানু।

রাশুর ঘরের কাছাকাছি এসে রাশুর গলার গান শোনা যায়। কানু সেদিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সেইদিকে। রাশুর ঘরের ভেজানো দরজা। গান শোনা যাচ্ছে। কানু এসে দাঁড়ায়।

মিড শট : দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে।

লং শট : ভেতরে দেখা যায় রাশু গান গাইছে আর সেই গানের তালে-তালে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে ভ্যাবলা কল্যাণী। আশেপাশে কতকগুলো বেড়াল। রাশু গাইছে—

"স্বামীর বুকে ঠ্যাং তুলে ঐ
দাঁড়িয়ে আছে মা কালী"

রিয়্যাকশন শট : বিগ ক্লোজ আপ : কানু

কানু আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলে। শব্দ হয়। ভয়ে চকিতে নাচ থামায় কল্যাণী। বসে পড়ে কোণায়। রাশু তাকায় দরজার দিকে। দরজার পাল্লা আর একটু ফাঁক হয়, দেখা যায় কানুর মুখ। রাশু হাসে। কল্যাণীর মুখে একটা হাসির মতো ভাব ফুটে ওঠে।

লং শট : রাশু কানুকে বলে—

রাশু ॥ এসো, এসো এসো, নাম কি ?

বিগ ক্লোজ আপ :

কানু ॥ কানাই।

মিড শট :

রাশু ॥ নিবাস ?

বিগ ক্লোজ আপ :

কানু ॥ কি ?

রাশু ॥ বাস কোথায় ?

কানু ॥ [আন্দাজে] মাধবপুর। কাঁসাই নদীর ধারে।

রাশু ॥ জেলা

কানু ॥ মেদিনীপুর

মিড শট :

রাশু ॥ পিতার নাম ?

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ স্বর্গত সুখময় কর। তুমি এ ঘরে থাকো ?

মিড কম্পোজিট শট :

রাশু ॥ হ্যাঁ, আমি থাকি আর কয়েকটা বেড়াল থাকে।

কানু ॥ [কল্যাণীকে দেখিয়ে বলে] ও কে ? তোমার বৌ ?

রাশু কল্যাণীর দিকে চায়। তারপর কানুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে—

রাশু ॥ না।

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ তোমার কি বৌ নেই ?

মিড কম্পোজিট শট :

রাশু ॥ ওই বেড়ালগুলোর মধ্যেই একটাকে বিয়ে করে ফেলবো।

কানু ॥ ধ্যুৎ।

কানু ছুটে বেরিয়ে যায়। তার মুখে 'কু ঝিক ঝিক ঝিক' শব্দ।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে কানু। নিজেদের ঘরের দিকে আসে কানু। দরজাটা ঠেলে আস্তে আস্তে।

দেখা যায় সরযূ শুয়ে আছে মাটিতে। দরজাটা আস্তে আস্তে আবার বন্ধ করে দেয় কানু।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যায়। শশাংকর ঘরের সামনে আসে। দরজার সামনে কান পাতে। নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়, খুব আস্তে দরজাটা ঠেলে কানু।

লো অ্যাঙ্গেল শট : ভেতরে খাটের ওপর শশাংক ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা উঠছে নামছে। একটা মাছি ভড়ার শব্দ পাওয়া যায়। মাছিটা এসে শশাংকর নাকের ওপর বসে। শশাংক ঘুমের মধ্যেই নাক ঘষে হাত দিয়ে।

ঘরের ভেতর থেকে দেখা যায় আধ ভেজানো দরজার মাঝখানে কানুর মুখ। মুখে অল্প ভয়। একটা জোরে নাক ডাকার শব্দ হয়। কানু দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

মিড শট : কানু গান গায়—"স্বামীর বুকে ঠ্যাং তুলে ঐ
দাঁড়িয়ে আছে মা কালী।"

লং শট : বাড়ির অন্য দিকে যাচ্ছে কানু নাক ডাকার শব্দ করতে করতে। সিঁড়ি দিয়ে আবার নামছে। নিচে নেমে অন্য একটা ঘরের ভেতর ঢোকে। ঘর জোড়া রাজা-রানী, সন্ন্যাসীর, নানান পোশাক, মুকুট, তলোয়ার সব দেওয়ালে টাঙানো।

লো অ্যাঙ্গেল মিড শট : তারপর প্যানিং : দু'তিনটে পুরোনো মরচে ধরা ট্রাঙ্ক। তার গায়ে ময়লা, অস্পষ্ট হয়ে আসা সাদা কালিতে লেখা 'অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, প্রোঃ শ্রীশশাংকনারায়ণ রায়, বন্দিপুর।' কানু মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইসব দেখতে থাকে। হঠাৎ Sound Track-এ যাত্রার বাজনা বেজে ওঠে।

cut to

মিড শট :

দেখা যায় যাত্রা।

রাজায় রাজায় তলোয়ার নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে—এক রাজা আর এক রাজার মাথায় তলোয়ারের বাড়ি মারে—আহত রাজা শুয়ে পড়ে মাটিতে চিৎকার করে। শশাংক দরজা ঠেলে সেই ঘরে ঢোকে। কানুকে দেখে বিরক্তি ও রাগে ভরে ওঠে শশাংকর মুখ।

মিড কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : কানু) :

শশাংক ॥ এ ঘরে ঢুকেছ কেন ?

কানু ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে তাকায়। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। বিগ ক্লোজ আপ : তারপর দেখে নিয়ে শশাংকর নাক ডাকার শব্দ করতে থাকে।

মিড শট : দেওয়ালে ঝোলানো একটা যাত্রার তলোয়ার নিয়ে চারদিকে সাঁই সাঁই করে কয়েকবার ঘোরায় শশাংক। দেওয়ালে ঝুলছে একটা পরচুলা।

মিড শট : তলোয়ারের ডগা দিয়ে চুলটা টেনে নিয়ে মাথায় চেপে বসায়। ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে। সামনে আয়না। সেই দিকে তাকিয়ে শশাংক মুচকি হাসে। পেছনের জানলা দিয়ে দেখা যায় কানু কখন ফিরে এসে অদ্ভুত চোখ নিয়ে আগ্রহভরে দেখছে শশাংককে (বিগ ক্লোজ আপ)।

cut to

দৃশ্য ১২ : রাত্রি

মিড শট : শশাংকর ঘর। শশাংক টেবিলে লিখছে। সামনে আলো সে নাটক বা যাত্রাপালা জাতীয় কিছু লিখছে। সরযূ ঘর থেকে বেরিয়ে শশাংকর ঘরের দিকে আসছে। তার হাতে কাগজে মোড়া কিছু একটা ধরা। শশাংকর ঘরে ঢুকে যে খাটে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে। প্যাকেট থেকে বেরিয়ে আছে দুটো রঙীন শাড়ী।

মিড কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : শশাংক) : শশাংক ঘুরে তাকায়। সরযূ বলে—"এসব আমার ঘরে রেখে আসবার মানে কি ?" জানোনা আমি বিধবা, এসব ঠাট্টার মানে কি ?

শশাংক ॥ করলামই না হয় একটু ঠাট্টা।

সরযূ ॥ না, এর চেয়ে আবার বিয়ে করলেই পারো।

লং শট : তারপর প্যানিং : শশাংক তাকায়—তারপর শশাংক উঠে বালিশের তলা থেকে একটা চাবি নিয়ে আলমারি খুলে কিছু একটা বের করতে করতে শশাংক তাকিয়ে দেখে, তারপর একটা গয়নার বাক্স আলমারি থেকে বার করে শশাংক।

মিড শট : আলমারি চাবি দিয়ে বন্ধ করে সরযূর দিকে এগিয়ে গিয়ে গয়নার বাক্সটা বাড়িয়ে দেয়। সরযূ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায়।

মিড কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : সরযূ) :

সরযূ ॥ কি ?

শশাংক ॥ যমুনার গয়নার বাক্স। আপনার কাছে রাখুন।

সরযূ ॥ আমার এসব চাই না।

শশাংক ॥ আমার চাই।

ক্যামেরা প্যান করে : শশাংক এগিয়ে আসে সরযূর দিকে। হঠাৎ দু'হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরে। তারপর এগিয়ে নিয়ে আসতে চায় সরযূর শরীর নিজের দিকে। মিড শট : সরযূ বাধা দেয়। শশাংকর মুখে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা ফুটে ওঠে। শশাংক জোর করতে থাকে। সরযূ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। প্রাণপণে। তারপর একসময় ছিটকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।

সরযূ ॥ আমার অবস্থার সুযোগ নিতে লজ্জা করে না তোমার ? তুমি যা চাও তাই হবে ? সব বদলে যাবে ? [শশাংকর মুখ। হেরে যাচ্ছে সেই মুখ]

ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে :

সরযূ ॥ যমুনার ওপর তোমার রাগ। তার শোধ আমার ওপর তুলতে চাও কেন ? আমি তোমার কি করেছি ?

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখ। সেই হেরে যাওয়া মুখে রাগের ছায়া পড়ে।

cut to

দৃশ্য ১৩ : রাত্রি শেষের ভোর।

লং শট, তারপর জুম-ফরোয়ার্ড : শশাংকর বাড়ী দেখা যায়। সরযূর ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুলে যায়। সরযূ ও কানু বেরিয়ে আসে। সরযূর হাতে সুটকেস। তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

আমবাগানের পাশ দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে ওরা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

মিড শট : স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে টিকিট কাটছে সরযূ। কাউন্টারে একজন লোক বলে—"কোথায় যাবেন ?

সরযূ বলে—"কোলকাতার ট্রেন কটায় ?"

লোকটি বলে—"এক্ষুণি ইন করবে। তাড়াতাড়ি করুন।"

সরযূর মুখ। এখনো সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ওর মুখের ওপর দূর থেকে আসা ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। লো অ্যাঙ্গেল শট (ব্যাকগ্রাউণ্ডে সরযূ) : একটি লোক হুড়মুড় করে প্রায় সরযূকে ঠেলে কাউন্টারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"কোলকাতা একটা ফুল, একটা হাফ"। তারপর পেছনে তাকিয়ে বলে তাড়াতাড়ি, "এই গদা তাড়াতাড়ি আয় নারে।"

লং শট : সরযূ কাউন্টার থেকে সরে আসে। প্লাটফর্মে ট্রেন ইন করে।

মিড কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : কানু) : কানু বলে—"মা ট্রেন চলে গেল যে, যাবে না।

সরযূ ॥ না।

লং শট (প্রেফারেন্স : সরযূ) : ট্রেন চলে যায়। সরযূর মুখ। ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবার শব্দ শোনা যায়। ক্যামেরা তার মুখের ওপর।

cut to

দৃশ্য ১৪ : ভোরবেলা

মিড শট : চায়ের কাপ হাতে সরযূ (ব্যাকগ্রাউণ্ডে লং শটে দেখা যায় পালোয়ান দুজন কুস্তি লড়ছে)।

চা নিয়ে সরযূ শশাংকর ঘরে ঢোকে। থানের বদলে শশাংকর দেওয়া শাড়ী পরে।

মিড শট : শশাংক ঘুমিয়ে আছে। সরযূ সামনের টেবিলে চা রাখে।

সরযূ ॥ চা।

শশাংক পাশ ফিরে শোয়। ক্লোজ আপ : সরযূ জানলার পাশে সরে আসে। মিড শট : জানলা দিয়ে দেখা যায় পালোয়ান দু'জন কুস্তি করছে। তাদের মুখের শব্দ শোনা যায়। সরযূ জানলা থেকে মুখ ক্যামেরার দিকে ঘোরায়। তাকায় অন্যমনস্ক ভাবে। তার কপালের টিপ ঘসে গেছে। সরে এসে আয়নার দিকে তাকায়। কাপড় দিয়ে টিপ মুছে ফেলে। আয়নায় দেখা যায় শশাংককে।

সরযূ খাটের দিকে এগিয়ে যায়। দাঁড়ায়। তারপর—বলে "চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে"। শশাংক তাকায় বলে—"কটা বাজে"?

সরযূ বলে—"পালোয়ানরা এসে গেছে।"

মিড শট (ব্যাকগ্রাউণ্ডে সরযূ) : শশাংক উঠে বসে। চা নেয়। চুমুক দেয়।

সরযূ বলে—"তোমাকে একটা কথা বলবো।"

সরযূ বলে—"কানুর সামনে তুমি আমাকে নাম ধরে ডেকো না।"

শশাংক ॥ (off voice) কেন?

সরযূ ॥ ও তুমি বুঝবে না।

মিড শট : [যেতে যেতে তারপর কিছু একটা মনে পড়ার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে]

সরযূ ॥ আমার কিছু টাকা লাগবে। কানুর স্কুলের বই খাতা কিনতে হবে। নতুন জামা কাপড়ও দু'একটা লাগবে।

ক্লোজ আপ :

সরযূ ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালে শশাংক ডাকে। সরযূ তাকায়।

শশাংক ॥ আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

সরযূ ॥ কি?

ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ তুমি যা কিছু করছো সবই কি কানুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে?

[সরযূ আস্তে আস্তে চোখ নামায়।]

মিড শট :

সরযূ ॥ জানিনা। (তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়)

সরযূ এসে নিজের ঘরে ঢোকে। ক্লোজ আপ : বিছানায় শুয়ে আছে কানু। কানু চোখ খুলে বলে—"রাত্রিবেলা তুমি ঘুমোও নি?"

সরযূ ॥ হ্যাঁ।

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ রাত্রিবেলা বাবার স্বপ্ন দেখলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। তোমায় কত খুঁজলাম।

রিয়্যাকশন শট : সরযূর মুখ।

দৃশ্য ১৫ : বেলা হয়েছে

লং শট : সরল সাইকেলে আসছে।

শশাংকর বাড়ির বাইরে থেকে সরল ডাকে— "শশাংকদা, শশাংকদা।"

সরল এদিক ওদিক তাকায়। আবার ডাকে—"শশাংকদা বাড়িতে আছেন?"

রাশু ॥ কে?

লো অ্যাঙ্গেল শট :

সরল ॥ শশাংকদা?

রাশু ॥ আছে।

সরল ॥ আছেন?

রাশু ॥ আসুন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে সরল বলে—"শশাংকদা"।

লং শট :

শশাংক ॥ কি ব্যাপার।

মিড শট (প্রেফারেন্স : শশাংক) :

সরল ॥ আমি আজ কোলকাতায় যাচ্ছি রাত্রির ট্রেনে, দেখা করতে এলাম।

[শশাংকর মুখ। একটা চাপা বেদনা ফুটে ওঠে সেই মুখে]

শশাংক ॥ আয়। [শশাংক টেবিলে বসে আছে। সরল দরজা দিয়ে ঢোকে।]

মিড শট :

শশাংক ॥ আজই যাচ্ছিস?

সরল ॥ হ্যাঁ, ঠিক নেই কিছু। ওরা ধরছে খুব। অনিল, শ্যামল, মাণিকরা। বলবো ওদের কথা?

মিড শট :

শশাংক ॥ অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম। রাতের পর রাত রিহার্সাল চালিয়েছি। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, আবার কাজ শুরু করে দিয়েছি। তোর মনে আছে?

মিড শট :

সরল ॥ [মাথা নিচু করে] আছে, সব মনে আছে। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই।

ক্লোজ আপ : [শশাংক তাকায়]

বিগ ক্লোজ আপ :

সরল ॥ তোমার মতো শেকড় আঁকড়ে পড়ে থাকার সাহস আর আমার নেই। তাছাড়া লাভ কি? একটা সময় আসে শশাংকদা, যখন বেরিয়ে পড়তে হয়।

[একটু থেমে বলে] বেশী লোক আমার কাজ দেখুক, আমার মধ্যে যে ক্ষমতা আছে তা জানুক, বুঝুক। আমি একটু ভালোভাবে বাঁচি তা কে না চায়।

বিগ ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ ছাড়তেও হয় অনেক।

ক্লোজ আপ :

সরল ॥ জানি শশাংকদা। দেখি। ভালো না লাগলে ছেড়ে অন্য দলে চলে যাবো।

বিগ ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ যা। আমি কখনোই কাউকে বাধা দিইনি, কাউকে ধরেও রাখতে যাইনি, তুই জানিস।

মিড শট : [সরল তাকায় শশাংকর দিকে। শশাংক অন্য দিকে চেখে ফেরায়।]

ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে :

সরল ॥ তুমিও যেতে পারতে কোলকাতা। ওখানে কত নতুন কিছু হচ্ছে। নতুন নতুন জিনিস নিয়ে পালা লেখা হচ্ছে। কত রকমের কাজ হচ্ছে। এখানে থেকে জানবে কি করে সেইসব। পুরোনো জিনিসকে তুমি আর কতদিন ধরে রাখবে শশাংকদা (বিগ ক্লোজ আপ)।

বিগ ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ তুই এতদিন আমার সঙ্গে কাজ করে আজ এই কথা বললি সরল ? আমি পুরোনো সময়কে ধরে রাখতে চাই এটা ভুল কথা। আমি যে চরিত্র নিয়ে কাজ করেছি তাদের বিরাটত্ব, তাদের মহত্ত্ব, তাদের গ্র্যানজার আমাকে টানে। আমার মনে হয় আজ এসবের বড় অভাব। যাকগে, আমি যেভাবে বুঝি সেভাবেই কাজ করছি।

ক্যামেরা ফ্রেমের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে স্লো প্যান করে :

[একটু থেমে] যে যার নিজের মতো করে বাঁচে সরল।

[তারপর বসে পড়ে একটু থেমে] তুই আয়।

সরল দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। তাকায় শশাংকর দিকে।

কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স: সরল) :

সরল ॥ এখানকার রিহার্সাল তো দু'তিন দিন শুরু হয়ে গেছে। তুমি যাচ্ছো না ?

[ব্যথিত চোখে] কি সব করছে শুনলাম। তোমায় খবর দেয়নি ?

মিড শট : শশাংক জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়।

[শশাংক তারপর প্রায় চকিতে ঘুরে দাঁড়ায়।]

cut to

দৃশ্য ১৬ : দিন

লং শট : একটা রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে যাচ্ছে শশাংক। রিক্সার পেছনের পর্দা দিয়ে শশাংক দেখতে পায় রিক্সায় কানু বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। শশাংকর গাড়ী এসে থামে চন্দ্র নাট্য কোম্পানীর সামনে। শশাংক নামে। নাট্য কোম্পানীর অফিসে গুঠার ঘোরানো সিঁড়িটা উঠে গেছে রাস্তা থেকেই। শশাংক উঠে আসছে তার ওপর দিয়ে। অফিসের ভেতরে ভূপতি ও অন্যান্যরা বসে আছে। মাঝখানে বসে আছে বছর চল্লিশের মেদময় কষ্ট করে শরীর ধরে রাখা এক ফর্সা মহিলা। পেছনে তার রোগা যুবতী মেয়ে। সে মহিলাটির খোলা চুলের খানিকটা জায়গা খামছে ধরছে। মহিলাটি মাঝে মাঝেই আরামে আঃ আঃ করে শব্দ করছে। একটা পালার মহড়া হচ্ছে। শশাংককে ভেতরে ঢুকতে দেখে ভূপতি উঠে দাঁড়ায়। বলে— "আসুন আসুন শশাংকদা।" শশাংক ভেতরে ঢোকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয় কয়েকটা নতুন মুখ।

লং শট : ভূপতি বলে—"আজ তিন দিন মহড়া চলছে। আপনার দেখা নেই। তারপর মহিলাটিকে দেখিয়ে বলে—"রেবা দেবী —ইনি করছেন তমাললতা। মহিলাটি দু'হাত অদ্ভুতভাবে তুলে হাত জোড় করে নমস্কার করে—বলে, "নমস্কার"।

ভূপতি ॥ আর ইনি শশাংকশেখর সেন। মানে দলের আদি···

লং শট :

শশাংক ॥ [বিরক্ত] তমাললতা মানে ?

ভূপতি ॥ "বধু হলো বাইজী"। জানেন তো ?

লো অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ না জানি না।

মিড শট :

ভূপতি ॥ কেন মণ্টুবাবু যে বললেন আপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবেন !

শশাংক ॥ না দেয়নি।

ভূপতি ॥ আঃ, এই দেখ।

লং শট : মহিলাটির মেয়ে একটু আস্তে চালাচ্ছিল হাত।

মহিলাটি বলে "আঃ, টান না জোরে।"

তারপর শশাংকর দিকে তাকিয়ে বলে "আপনি নাকি (শুনলাম) দারুণ করেন। সেই কলকাতা থেকে আপনার নাম শুনছি।"

ভূপতি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ইনিও করছেন মেইন পার্টে।

মিড কম্পোজিট শট :

শশাংক কোন কথা না বলে বাইরে চলে আসে। তার মুখ গম্ভীর ও অপমানিত। ভূপতি এসে দাঁড়ায়, বলে—"কি দাদার মুড অফ্, মনে হচ্ছে!"

শশাংক ॥ মণ্টুবাবু কোথায় ?

ভূপতি ॥ গোলায়।

শশাংক ॥ দেখা করতে বলবেন।

ভূপতি ॥ আচ্ছা।

cut to

দৃশ্য ১৭ : দিন

লং শট : মণ্টুবাবু আসছে, সে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে, বারান্দা দিয়ে হেঁটে যায়, পেছনে সরযূকে দেখা যায়।

লং শট : **শশাংক** ॥ আসুন।

মণ্টুবাবু ॥ ডেকেছিলেন ?

শশাংক ॥ হ্যাঁ।

মণ্টুবাবু ॥ রিহার্সালে দেখলাম না তো ?

শশাংক ॥ ব্যস্ত ছিলাম।

মণ্টুবাবু ॥ [মুচকি হেসে] জানি জানি।

[একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গিতে] তবে এঁটো জিনিস চাখতে গেলেন কেন ? আমাদের বললেই পারতেন।

শশাংক ॥ রিহার্সাল শুরু হয়েছে জানাননি তো ?

লং শট :

মণ্টুবাবু ॥ এই দেবো দেবো করছিলাম। তা ভাবলাম দু-একটা দিন পরেই না হয় বিরক্ত করবো। আপনি আবার এখন ব্যস্ত তো।

ক্লোজ আপ : [একটু খোসামুদে গলায়] আপনি না এলে মশাই সব ম্যাদা মেরে যায়। ওদিকে শুনেছেন তো সরলটা কোলকাতার দলে ভিড়েছে। আবার

এদিকে দল ভাঙানোর চেষ্টা করছে। নিজে হাতে তৈরী করলেন তার এই! অবশ্য আমিও একটা এনেছি।

[শশাংক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায়।]

ক্লোজ আপ : কলকাতার মাল। বয়স একটু অবশ্যি। টাকা লাগে লাগুক, চেষ্টা করে দেখি। আপনাকে কিন্তু এবার মেইন পার্টটা করতে হবে।

হাই অ্যাঙ্গেল মিড শট : **শশাংক** ॥ না, আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এবার আমার পালাটা করবেন।

মিড শট :

মণ্টুবাবু ॥ আপনার ঐ কয়েদখানার গপ্পো চলবে না। ওসব জ্ঞানের কথা আজকাল কেউ শুনতে চায় না। করলাম তো আগেরটা, দেখলেন তো। এসব কেউ চায় না।

হাই অ্যাঙ্গেল মিড শট :

শশাংক ॥ লোকে কি চায় ?

মণ্টুবাবু ॥ [তাকায়] বড় বড় কথার যুগ সব শেষ হয়ে গেছে।

শশাংক ॥ এখন কি ছোট ছোট কথার যুগ। যাকগে আপনার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই, আপনি এসব জানেন না।

মিড শট :

মণ্টুবাবু ॥ না শশাংকবাবু জানি না। আমি জানতে চাইও না। আমি শুধু চাই ব্যবসাটা জানতে। যে টাকা ঢালবো তা যেন উঠে আসে, উঠে আসলে ব্যাস। এখন হলো কি জানেন, নবরসের যুগ। ভরত মুনির সেই নব রস। কাম, লালসা, দুঃখ, বিরহ, মিলন, যন্ত্রণা—এই সব আরকি। তেমন কিছু লিখুন, আমি আলবৎ ধরবো।

হাই অ্যাঙ্গেল মিড শট :

শশাংক ॥ দলটা আপনি নষ্ট করছেন মণ্টুবাবু।

মিড শট :

মণ্টুবাবু ॥ দলটা আমি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি আপনার কাছ থেকে।

হাই অ্যাঙ্গেল মিড শট :

শশাংক ॥ কিন্তু আমাকে কিনে নেননি।

লং শট : শশাংক চলে যায়, ব্যাকগ্রাউণ্ডে মণ্টুবাবু। ধীরে ধীরে মণ্টুবাবুর ওপর ক্যামেরা চার্জ করে।

cut to

দৃশ্য ১৮ : রাত্রি

লং শট : বারান্দা দিয়ে শশাংক হেঁটে আসছে।

সরযূর ঘর। খাটে শুয়ে আছে সরযূ। জেগে আছে সে। পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে কানু। ভেজানো দরজা খুলে যায়।

মিড শট :

ঘরে ঢোকে শশাংক। সরযূ উঠে বসে। শশাংক ও তারপর ছেলের দিকে তাকায়। শশাংকর মুখ দেখে বোঝা যায় মদ খেয়েছে সে। তার মুখ কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠেছে।

cut to

লং শট : আধো-অন্ধকার। বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে সরযূ। ক্যামেরার দিকে।

cut to

সরযূ Back to Camera হেঁটে যাচ্ছে। সামনে শশাংক। ওরা যমুনা ও শশাংকর ঘরে ঢোকে। পালংক। সরযূর মুখ। শোয়া। ক্যামেরা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্যান করে।

সরযূ ॥ কানু কাল জেগে গিয়েছিল রাত্তিরে।

শশাংক ॥ জানি।

সরযূ ॥ তোমার ঘরে।

[শশাংক দেওয়ালে যমুনার ছবির দিকে তাকায়]

মিড শট। প্যান টু ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ না।

সরযূ ॥ যমুনা যেন দেখছে মনে হয়।

শশাংক ॥ দেখুক।

cut to

মিড শট :

কানু চারপাশটা দেখে নিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ডাকে "মা, মা, মা।"

মিড শট :

সরযূ ঘরের ভেতর নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলে—"ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে।"

মিড শট :

কানু বলে "মা দরজা খোল।"

মিড শট :

সরযূ বলে—"কেন, কি করেছি আমি তোমার, যে দিনের পর দিন ছেলের সামনে আমাকে তুমি এমন করে অপমান করছো। তোমার নিজের ছেলে যদি হতো…।"

শশাংক ॥ না।

শশাংক সরযূর মুখ হাত দিয়ে চাপা দেয়। তারপর তাকায় দরজার দিকে

সরযূ ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—

cut to

মিড শট :

কানু দরজার সামনে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। ক্যামেরা তার চোখের দিকে এগিয়ে যায়। জল চিক্ চিক্ করছে সেই চোখে। off voice-এ সরযূর কান্না শোনা যায়।

cut to

দৃশ্য ১৯ : ভোরবেলা

লং শট : তা থেকে মিড শট, তা থেকে ক্লোজ আপ : পালোয়ান দুজন কুস্তি লড়ছে। ভোর হচ্ছে। সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। উড়ে যাচ্ছে পাখির দল। হঠাৎ, সশব্দে দরজা ধাক্কানোর শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তে তন্ময়তা ভেঙে ঘুরে দাঁড়ায় শশাংক। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

মিড শট : ঘুম থেকে সহসা জেগে ওঠা মুখে আতংক নিয়ে সরযূ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শশাংককে দেখামাত্র সে বলে—"কানুকে পাওয়া যাচ্ছে না।" বলেই শশাংকর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে

লং শট : ছুটে চলে যেতে থাকে বারান্দা দিয়ে অন্য দিকে। ওর কথা শোনা যায় —"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাগো, একি নরকের ঘুম পেয়েছিলো আমাকে।"

লো অ্যাঙ্গেল লং শট : শশাংক দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় সে কিছুটা সহসা দিশাহারা হয়ে পড়ে। তারপর ডাকে "রাশু, রাশু"

মিড শট : বারান্দা দিয়ে আবার দেখা যায় ছুটে আসছে সরযূ। গতি না থামিয়েই বলে। "কোথাও নেই।" তারপর ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে চোখে জল নিয়ে।

মিড শট : শশাংক নিচে একটা দুটো ভেজানো ঘর খুলে দেখে। কানু নেই। তারপর সহসা কি মনে হওয়ায় তার নাটকের ঘরের ভেজানো দরজা খোলে।

লং শট : দেখা যায় ঘরের আলো জলছে। মাটিতে রাজার মুকুট পরে আর তলোয়ার পাশে নিয়ে শুয়ে আছে কানু। ঘুমিয়ে আছে সে। চোখে জলের অল্প দাগ শুকিয়ে আছে। শশাংকর মুখ। সে দেখছে কানুকে। আস্তে আস্তে শশাংকর মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে। আশ্চর্য ভাবে কোমল হয়ে আসছে শশাংকর মুখ যা আমরা আগে দেখিনি।

লং শট : (টিল্ট-আপ ও প্যানিং সহ) : শশাংক এগিয়ে যায় ঝুঁকে দেখে কানুর মুখ। কানু সহসা জেগে ওঠে। কানু দেখে তার দিকে ঝুঁকে পড়া শশাংকর মুখ। ভয় পেয়ে যায় কানু। উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দরজার সামনে পড়ে থাকে মুকুট।

লং শট : কানু ছুটছে। বাড়ির বাইরে চলে যায়, কানু। বাড়ির পেছন দিকের একটা ভাঙা জায়গায় এসে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। শশাংক একটা ফাঁক থেকে লক্ষ্য করতে থাকে কানুকে। কানু দেখতে পায়না শশাংককে। শশাংকর মুখে অদ্ভুত এক মায়া ফুটে ওঠে।

লং শট : কানু একটি ভাঙা বাড়ির সামনে বসে গান ধরে—

"থাকিলে ডোবা খানা
হবে কচুরী পানা।
বাঘে গরুতে খানা
এক সাথে খাবে না।
স্বভাব তো মলেও
যাবে না।"

লং শট : কানু সরে যায় অন্য জায়গায়। শশাংক আবার ডাকে—"কানু"। কানু মুখ বাড়িয়ে তাকায়। দেখে শশাংকর মুখ। কানুর মুখ থেকে ভয় আস্তে

আস্তে কেটে যায়। এবার শশাংক দেখতে পায়না কানুকে। কানুর মুখ। হঠাৎ শশাংক কানুর সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন কানু তাকিয়ে দেখে শশাংকর দিকে।

cut to

দৃশ্য ২০ : দিন। আম বাগান

বৃষ্টির আগের ঝড়। উড়ে যাচ্ছে যত শুকনো পাতা। টাল-মাটাল করছে গাছের মাথাগুলো। বৃষ্টি শুরু হয় এক ফোঁটা, দু' ফোঁটা করে। নিমেষে তুমুল আকারে তা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিকে।

লং শট : গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে কয়েকটা ঘোড়া। ক্যামেরা জুম-ফরোয়ার্ড করে : ঘোড়ার ভেতর একটা সাদা রঙের। পেছন পেছন ছুটে আসছে সাত-আট জন লোক। একটা গাছের তলায় দেখা যায় শশাংক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে কানু। দুজনেই বেশ ভিজেছে। শশাংক লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বলে—"কি হোলো ? ওগুলো ছাড়া পেল কি করে ?"

মিড শড : ছুটতে ছুটতে একজন মুখ ঘুরিয়ে বলে—"কোন শালা সবগুলোর দড়ি গাড়ি থেকে খুলে দিয়েছে ! বানচোত।"

মিড শট (ব্যাকগ্রাউণ্ডে কানু) : ওরা চলে যায়। শশাংক কানুকে বলে—"ওই যে সাদা ঘোড়াটা, ওটা আমাদের ছিলো। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। মোট টানে।" শশাংক এগিয়ে যেতে থাকে। ক্যামেরা প্যান করে : একটু ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তোলে। বৃষ্টি এসে ধুয়ে দিচ্ছে তার মুখ।

মিড শট : সে ভাবেই সে বলে—"কানু, তুই বড় হয়ে কি হবি ?" কানুর উত্তর শোনা যায় না, শশাংক মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখা যায় একটু দূরে অন্য একটা গাছের তলায় সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কানু।

লং শট : শশাংক বলে—"কি হোলা" ? বৃষ্টি থেমে আসছে। কানু উত্তর দেয় না। শশাংক বলে—"কিরে তুই বোবা ?" মিড শট : কানু বলে—"তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন ? কম্পোজিট শট (প্রেফারেন্স : কানু) : শশাংকর মুখের ভাব বদলে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে বলে—"কেন ?" কানু বলে—"তুমি খারাপ লোক।" শশাংক বলে—"কে বলেছে, তোর মা ?" কানু উত্তর দেয় না। শশাংকর মুখ বিষন্ন হয়ে ওঠে। সে কানুর কাঁধে হাত রাখে।

লং শট : তারপর বলে "চল বাড়ি চল।" কানু শশাংকর হাত সরিয়ে দেয়। তার-

পর এগিয়ে যায় কিছুটা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে। শশাংক এগিয়ে যায় কানুকে ছাড়িয়ে। দেখা যায় পেছনে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটতে শুরু করেছে কানু।

কানু বলে—"তুমি আমার মাকে কষ্ট দাও কেন ?"

মিড শট : শশাংক যেতে যেতে বলে—"তোর মা, মাসী, সবাই আমাকে দিয়ে ওই বুড়ো ঘোড়াটার মতো মোট বইয়েছে।"

লং শট : কানু বলে—"তুমি মদ খাও কেন ?"

লং শট : **শশাংক** ॥ আমি তো ঘোড়া, মদ না খেলে ছুটবো কি করে।

লং শট :

কানু ॥ তুমি তো ছোটো না। খালি দাঁড়িয়ে থাকো ! [শশাংক হাসে]

লং শট :

কানু ॥ তুমি কুস্তি লড়ো কেন ?

মিড শট :

শশাংক ॥ আমি লড়ি না, ওরা লড়ে। আমি দেখি।

লং শট :

কানু ॥ কেন ?

শশাংক ॥ আমার ভালো লাগে। ওরা কবে একদিন একজন আর একজনকে খুন করে ফেলবে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করি।

কানু ॥ কেন ? ওরা তোমার কি করেছে ?

শশাংক ॥ অন্যদের ওপর আমার রাগ চলে যায় ওদের কুস্তি দেখতে দেখতে।

কানু ॥ তোমার এত রাগ কেন ?

শশাংক উত্তর দেয় না। কানু দৌড়ে ওকে পেরিয়ে চলে যায় কিছুটা দূরে।

লং শট : তারপর দূরে দাঁড়িয়ে বলে, "আমাকে ধরো, ছোটো।" শশাংক ম্লান হাসে। কিন্তু তার চোখে ঝলকে ওঠে খুশি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে শশাংক। কানু আবার ছুটতে থাকে। দূরে চলে যায় অনেকটা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে-"আমাকে ধরো, ছোটো। আমি বড় হলে তোমার মতো পালা লিখবো, যাত্রা করব।" শশাংকর মুখ। ক্লোজ আপ থেকে বিগ ক্লোজ আপ : খুশী তার মুখে। চিক্ চিক্ শব্দ করে একটা পাখী আকাশে উড়ে যাচ্ছে। শশাংক আকাশে তাকায়। একটা পাখী থেকে অজস্র পাখীতে আকাশ ভরে যায়।

cut to

দৃশ্য ২১ : রাত্রি

সরযূ শুয়ে আছে। ক্যামেরা প্যান করে : পাশে কানু। আস্তে আস্তে চোখ খোলে সরযূ। আধ ভেজানো দরজার দিকে তাকায়। তারপর আবার চোখ বোজে। একটা শব্দ হয় দরজায়। সরযূ চোখ খোলে আবার। দরজা ঠেলে একটা বেড়াল ঢোকে। সরযূ উঠে বসে। তারপর খাট থেকে নেমে দরজার কাছে যায়। দরজা খোলে। বাইরে তাকায়। আধো অন্ধকারে কেউ নেই। সরযূ এগিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। গ্রহ, তারা, চাঁদ ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। সরযূ সেদিকে তাকায়। মিড শট : মুখ সরিয়ে তাকায় শশাংকর ঘরের দিকে।

ক্যামেরা ট্র্যাক করে : সরযূ এগিয়ে যায় শশাংকের ঘরের দিকে। শশাংকর ঘর। গম্ভীর মুখে শুয়ে আছে সে। নাক ডাকছে। বিড় বিড় করে নড়ছে তার ঠোঁট। যেন কথা বলছে কারো সঙ্গে।

সরযূ দরজা বন্ধ করে দেয়।

রিয়্যাকশন শট : ক্লোজ আপ : সরযূ

cut to

দৃশ্য ২২ : দিন

ক্লোজ আপ :

একটা শ্বেত পাথরের খোদাই করা ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কানু। পাশে শশাংক। কানু পড়ছে, "১২৯০ সালে এইখানে রাম সেনের পৌত্র···ক্যামেরা টিল্ট-ডাউন করে : ফলকটা দেখা যায়। কানুর গলা শোনা যায়। কানু বলে—"এর মানে কি ?"

শশাংক (off voice) ॥ এরা ছিল এখানকার মস্ত জমিদার। মানে রাজা আর কি। সেই জমিদারের বুড়ো নাতি···

মিড শট :

শশাংক ॥ যখন মারা গেল তখন সেই জমিদারের নাত-বৌ স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় শুয়ে স্বর্গে গিয়েছিল।

লং শট :

কানু ॥ ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার বাবার দেখা হয়েছে। আমার বাবাও তো স্বর্গে।

কম্পোজিট শট : শশাংক এগিয়ে যেতে যেতে বলে "কানু, আমি যদি তোর বাবা হই ?

কানু ॥ ধ্যুৎ।

কানু সামনের দিকে তাকায়। একটা পুরোনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

কানু ॥ এটা কার বাড়ী ?

কম্পোজিট শট :

শশাংক ॥ এটা আমার বাবার বাবার বাবার বাড়ি। কানু হাসে।

লং শট, তারপর প্যানিং : শশাংক ভগ্নস্তূপের মতো একটা জায়গা দেখিয়ে বলে "ওটা হচ্ছে কয়েদখানা। এখানে মানুষদের কয়েদ করে রাখতো। টাকা আদায়ের জন্যে। টাকা ওরা পারে কোথায় ? টাকা তো ওরা দিতে পারতো না—তাই দিনের পর দিন এখানেই পচে মরতো।"

কানু ॥ কে থাকেন এখন ?

লং শট :

শশাংক ॥ এখন থাকে আমার বাবার বাবার বাবা আর তার বাবাদের ভূত।

কম্পোজিট শট :

কানু ॥ যাঃ [আর একটু থেমে বলে]—তুমি ভূত দেখেছো ?

মিড কম্পোজিট শট :

শশাংক ॥ হ্যাঁ ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে। তারপর একটু অন্যমনস্ক হয়ে থেমে অন্যস্বরে বলে, এই ইটগুলো, দরজা জানলা, এরা সবাই আমার সঙ্গে কথা বলে।

কানু ॥ কি কথা ?

লং কম্পোজিট শট :

শশাংক ॥ বলে শশাংকবাবু, লেখো, এই কয়েদখানার গপ্পো লেখো।

কানু ॥ তুমি লেখোনি ?

শশাংক ॥ হুঁ, লিখেছিলাম পালা, "কয়েদখানা"। মন্টু দত্ত তো সে পালা করলো না।

কানু ॥ মন্টু দত্ত কে ?

শশাংক ॥ মন্টু দত্ত হলো, মন্টু দত্ত হলো চন্দ্র কোম্পানীর মালিক।

কানু ॥ কোম্পানী, মানে যাত্রা ?

মিড কম্পোজিট শট :

শশাংক ॥ হ্যাঁ।

কানু ॥ আমি যখন বড়ো হবো, আমি একটা কোম্পানী খুলবো, আমিই তোমার পালা করবো।

শশাংক হাসে। বলে, "তুই যখন বড় হবি আমি তখন মরে ভূত।"

কানু ॥ ধ্যুৎ।

শশাংক অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকে কানুর দিকে। তারপর কানুকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় সিঁড়ির একটা উঁচু ধাপে। সরে গিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে হঠাৎ যাত্রার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর "কয়েদখানা" পালা থেকে পার্ট বলতে থাকে।

লং শট (ব্যাকগ্রাউণ্ডে ধ্বংসস্তূপ) : "রাজা ! আর কত বছর ? একশো দুশো তিনশো নাকি আরো হাজার হাজার বছর ! তুমি কি শুনতে পাওনা আমাদের দীর্ঘশ্বাস ! আমাদের যন্ত্রণার হাহাকার ! [ক্যামেরা জুম ফরোয়ার্ড করে] আমাদের বুক চাপড়ানোর শব্দ। আশ্চর্য রাজা, সত্যিই আশ্চর্য এই কয়েদখানা, আমাদের হাজার বছরের পৃথিবী এই কয়েদখানার ভেতরে বন্দী হয়ে আছে, কেটে যাবে আরো কত হাজার বছর।

(শশাংক বলে চলে) পৃথিবী ভরে উঠবে আরো অনেক অনেক কয়েদখানায়। নতুন সব মানুষদের জন্যে, এইভাবে, ধীরে ধীরে, যেদিন তোমার সমস্ত সাম্রাজ্যই একটা বিশাল কয়েদখানা হয়ে উঠবে, তখন তুমি কি করবে রাজা ?"

চারদিকে সহসা যাত্রার বাজনা বেজে ওঠে। কানুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে দেখছে শশাংককে।

একজন লোক ছুটে আসছে। লোকটিকে আগে দেখা গেছে। ছুটে এসে শশাংক ও কানু যেখানে ছিল সেখানে ঢুকে পড়ে।

বিগ ক্লোজ আপ : চিৎকার করে ডাকে "শশাংকদা"

[যাত্রার বাজনা থেমে যায়। ঘোর ভেঙে শশাংক তাকায় ওর দিকে।] লোকটি বলে, "রাশু গাছে চড়ে বসে আছে সকাল থেকে। কিছুতেই নামছে না।"

cut to

নেপথ্যকণ্ঠে ॥ শশাংকদা, শশাংকদা।

বিগ ক্লোজ আপ :

একজন ॥ রাশু মন্দিরের কাছে গাছে চড়ে বসে আছে সেই সকাল থেকে, কিছুতেই নামছে না।

শশাংক ॥ রাশু, রাশু, রাশু নেমে আয় বলছি ?

দৃশ্য ২৩ : বিকেল

লো অ্যাঙ্গেল শট, শটের মধ্যে ক্যামেরা টিল্ট-আপ করে : একটা উঁচু গাছের ডাল থেকে আর একটা ডালে উঠে যায় রাশু। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ইটের টুকরো, ঢিল, ছুঁটে আসছে তার দিকে। রাশু চুপচাপ বসে আছে। শরীর বাঁচানোর চেষ্টা করছে না। নিচে বেশ ভীড়। অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। দু'একটা বাচ্চা ছেলে ঢিল ছুঁড়ছে। দু'একজন থামাচ্ছে তাদের। লোকজনদের ভাব ভঙ্গি অনেকটা মজা দেখার মতো। সামনেই একটা ঠেলায় খাবার বিক্রি করছে একজন। একটা মেলা মেলা ভাব।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ কি হয়েছিল কি ?

একজন উত্তর দেয়—"কাল সন্ধ্যায় ওই কল্যাণীটাকে নিয়ে শিব মন্দিরে যায়, মালা বদল করে সিঁদুর পরিয়ে বে করে আসে। তারপর সকালে সেই ঝিলের ধারে কল্যাণীকে মরে পড়ে থাকতে দেখে। তারপর থেকে তো এই। কেন আপনাকে কিছু বলেনি ?"

রিয়্যাকশন শট : লো অ্যাঙ্গেল শট : রাশুর মুখ।

cut to

দৃশ্য ২৪ : সন্ধ্যা

লং শট :

কানু ॥ স্বামীর বুকে ঠ্যাং তুলে ঐ
দাঁড়িয়ে আছে মা কালী

বারান্দা দিয়ে দেখা যায় কানু আর শশাংক আসছে। কানু ডাকে "মা, মা, মা" মিড শট : সরযূ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, ওদের দু'জনকে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়।

লং থেকে মিড শট :

কানু ॥ মা জানোতো, রাশুদা না একটা গাছে চড়ে বসে আছে, কিছুতেই নামছে না। আমরা ডাকলেও নামছে না।

ঘরে আলো জ্বালে। ক্যামেরা প্যান করে : আলমারি খুলে মদের বোতল বের করে শশাংক গ্লাসে ঢালে। একটু একটু করে মদ খাচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে মুখ মোছে। আঃ শব্দ করে গ্লাসটা টেবিলে একটু জোরে নামিয়ে রাখে।

লং শট : সরযূ এসে ঘরে ঢোকে। কম্পোজিট শট : (প্রেফারেন্স : শশাংক, ব্যাকগ্রাউণ্ড সরযূ) : শশাংক তাকায়।

সরযূ বলে,—"তোমায় একটা কথা বলবো।"

শশাংক ॥ বলো।

সরযূ ॥ [একটু চুপ করে থেকে বলে] কানুকে তুমি ছেড়ে দাও।

শশাংক অবাক হয় বলে—"মানে ?"

সরযূ ॥ তোমার হুঁশ নেই, মানে তুমি বুঝবে না, ওকে ছেড়ে দাও তুমি, [শশাংক আবার মদ খেতে থাকে] আমাকে এর বেশী কিছু বলতে বলো না।

মিড শট : শশাংকর মুখ। রাগে ও অপমানে প্রচণ্ড ভারী হয়ে উঠছে। গ্লাসটা তুলে আবার এক ঢোকে সবটা খেয়ে নেয় শশাংক। সরযূর দিকে তাকায়। বলে—"এসব বলার মানে"। শশাংক আবার মদ ঢালে। সরযূ বলে—"আমাকে এর বেশি বলতে বোলো না।" সরযূ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শশাংক আবার এক-ঢোকে সবটা মদ খেয়ে ফেলে, জোরে গ্লাসটা নামিয়ে রাখে। তার মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। শশাংক তাকায়।

cut to

দৃশ্য ২৫ : রাত্রি

শশাংক হেঁটে আসছে বারান্দা দিয়ে।

বিগ ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখ।

লং শট : শশাংক হাঁটছে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে। দু'পাশের গাছ সরে যাচ্ছে।

হাই অ্যাঙ্গেল লং শট : একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ায় শশাংক।

শশাংক ডাকে 'রাশু'। ক্যামেরা প্যান করে।

গাছের ওপর থেকে রাশু কোন সাড়া দেয় না। শশাংক আবার বলে,—'আমার

সঙ্গে কথা বল রাশু, রাশু, রাশু আমার সঙ্গে কথা বল রাশু।" রাশু কোন কথা বলে না।

হাই অ্যাঙ্গেল মিড শট : শশাংক বলে—"ঐ ফাঁকা বাড়িতে তুই আর আমি এত-কাল থেকেছি। একসঙ্গে। তুই আমাকে ছাড়িসনি। আমার আর কথা বলার কেউ ছিলনা তুই ছাড়া।"

রাশু ॥ আমার কোন কথা নাই।"

শশাংক ॥ একটা মেয়েছেলের জন্যে ?"

রাশু ॥ না।

শশাংক ॥ তবে ?

লো অ্যাঙ্গেল লং শট :

রাশু ॥ সে আপনি বুঝবেন না, আমার মন নাই কিছুতে।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ আমারও বৌ পালিয়ে ছিল রাশু, আমি তোর মতো গাছে চড়ে বসে থাকিনি।

লো অ্যাঙ্গেল শট :

রাশু ॥ আপনি মাটিতে ঝুলে আছেন। আমি গাছে চড়ে বসে আছি। এই গাছের মাথা থেকে আমি সব দেখতে পাই।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ কি দেখতে পাস ?

লো অ্যাঙ্গেল শট :

রাশু ॥ আকাশ, তারা, কল্যাণীর মুখ।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাশু।

লো অ্যাঙ্গেল শট :

রাশু ॥ [কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে] গত পরশু বিকেলবেলা, সে আর আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম, বর বৌ মালা বদল করেছিলাম, আমরা বর আর বউ।

cut to

ফ্ল্যাস ব্যাক :

লং শট : শেষ বিকেল। একটা কাদা মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে

কল্যাণী ও রাশু। কাদার ওপর তাদের পা ফেলার প্যাচ প্যাচ শব্দ হচ্ছে। তারা পথের পাশে একটা মন্দির দেখে মন্দিরটাকে প্রণাম করে।

রাশু বলে—"তোকে সাতমহল প্রাসাদ গড়ে দেবো। হাজারটা বাঁদী রেখে দেবো। হাজারটা ছেলে বিয়োবি তুই, কিরে পারবি না ?

কল্যানী কি বোঝে কে জানে। অদ্ভুতভাবে হাসে। তার মুখ দিয়ে কথার মতো শব্দ বার হয়।— ওরা আসছে।

প্যাচ প্যাচ শব্দ হচ্ছে কাদার। শেষ কাকের দল বা বকের দল উড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার আঁধার নামছে। চারজন লোকের মুখ দেখা যায়। গাছের আড়ালে। নিরীহ ও গোবেচারার মতো মুখ তাদের। একজন বিড়ি খাচ্ছে। তারা দেখছে রাশু ও কল্যাণীকে। সামনে থেকে এসে রাশু ও কল্যাণী Back to Camera হাঁটতে থাকে। কল্যাণী পেছনে। লোকগুলো দেখছে। নড়ে চড়ে জায়গা বদল করে তারা।

লং শট : রাশু ও কল্যাণী ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। পেছনে কল্যানী। হঠাৎ সেই চারজন ছুটে এসে পেছন থেকে কল্যানীকে জাপটে ধরে তুলে নিয়ে যায় জঙ্গলের ভেতর। কল্যাণীর চাপ দেওয়া মুখ থেকে অদ্ভুত ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে আসে। প্যাচ প্যাচ শব্দে তা শোনা যায় না। রাশু এগিয়ে আসছে। হঠাৎ তার খেয়াল হয়। পেছন ফিরে তাকায়। কল্যাণীকে দেখা যায় না। রাশু পেছনে ছুটে যায়। ডাকে—"এই কল্যাণী।" এদিক ওদিক তাকায়। গাছের পাতায় পাখির ডানা নাড়ার শব্দ শোনা যায়। কল্যাণীকে দেখা যায় না।

cut to

লং থেকে এক্সট্রিম লং শট : ভোর হচ্ছে। একটা চড়ার নরম মাটিতে দেখা যায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কল্যাণীর শরীর। শাড়ী নেই। খোলা পায়ের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। পায়ের আঙুল জলের ভেতর। রাশুকে দেখা যায় সামনে দাঁড়ানো। হঠাৎ ছুটতে শুরু করে রাশু। রাশু ছুটছে। বনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে রাশু। তার মুখ আর স্বাভাবিক নয়।

ফ্ল্যাস ব্যাক শেষ :

লো অ্যাঙ্গেল শট :

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রাশু আবার বলে—"বাবু, কল্যাণী বোবা ছিল। জন্মো বোবা। কোনদিন কথা বলতে পারে নাই। মনে বড় দুঃখ ছিলো।

আমিও তাই কারোর সঙ্গে কথা বলতাম না। সে আমারে ইশারা করে ঠোঁট নেড়ে কথা বলতে চাইতো বাবু। সে আমারে ইশারা করে কথা বলতে চাইতো। আমি তা বুঝতাম বাবু।"

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ তুই আমার সঙ্গে কথা বলতিস রাশু।

লো অ্যাঙ্গেল শট :

রাশু ॥ ও-গুলো কথা নয় বাবু, অভ্যাসবশে বলতাম। আপনার সঙ্গে আমার আসল কথা হয় নাই। আপনি বলতেন আমি পিঠে উত্তর দিতাম।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

শশাংক ॥ আসল কথা নয় মানে, আসল কথা নয় মানে কি রাশু ?

[রাশু উত্তর দেয়না]

রাশু, রাশু, রাশু,

[রাশু কোন কথা বলে না আর]

cut to

দৃশ্য ২৬ : ভোরবেলা

মিড লং থেকে লংশট : দেখা যায় রাশুর দেহ একটি গাছের নীচে পড়ে আছে।

একজন ॥ যা নিয়ে আয়।

মিড শট : রাশুর লাশ নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন—"বল হরি হরিবল"

রাশুর শব নিয়ে ছোট একটা দল চলেছে নিঃশব্দে একটা উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে। দলটি চলে গেলে দেখা যায় শশাংকর মুখ। ক্যামেরা ওর মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

cut to

দৃশ্য ২৭ : দিন

রিয়্যাকশন শট : ক্লোজ আপ : শশাংকর মুখ।

ক্যামেরা টিল্ট-ডাউন করে : শশাংকর নাটকের ঘর। আয়নার সামনে দাঁড়ানো শশাংকর মুখ। মুখে রঙ মাখছে শশাংক। যাত্রার পোশাক পরছে। মাথায় পরেছে পরচুলা। ভ্রূ আঁকছে। মুখটা আস্তে আস্তে আয়নার আরো কাছে

নিয়ে যায়। হঠাৎ ঝটকা মেরে মুখটা ঘোরায়। তারপর বিড়বিড় করে নতুন লেখা পালার লাইন বলতে থাকে।

বিগ ক্লোজ আপ :

শশাংক ॥ মৃত্যুর জানালা দিয়েও জীবনকে দেখা যায় মহারাজ। বিশ্বাস আর ভালবাসার যে জগৎ আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, তা যেন আবার আমার চারপাশে ফিরে আসছে। আমাকে নতুন করে বেঁচে থাকার কথা বলছে। মহারাজ, মৃত্যু কখনো শেষ কথা নয়, জীবনই শেষ কথা। (ক্যামেরা শশাংকের আবৃত্তির মধ্যে জুম-ব্যাক করে, পেছনে কানুকে দেখা যায়।) খুট করে শব্দ হয়। শশাংক সেদিকে তাকায়। দেখা যায় দরজার পাল্লাটা অল্প খুলে মুখ বাড়িয়ে শশাংককে দেখছে কানু।

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ তুমি কি করছো এখানে ?

মিড শট : শশাংক তাকায় কানুর দিকে। কোন কথা বলে না। তারপর মুকুটটাকে খুলে রাখে। পোশাকও খুলে রাখে। সামনের একটা ছোট তোয়ালের মতো কাপড় দিয়ে মুখ মুছতে থাকে।

কানু ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে দেওয়ালের কাছে দাঁড়ায়। বলে—

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ তুমি দু'দিন ধরে চুপচাপ বসে আছো কেন ? আমি কতবার এসে ফিরে গেছি।

ক্লোজ আপ : শশাংক কানুর দিকে তাকায়। ওর মুখের ভাব বদলায়। ও বলে—"আমি একজনকে খুঁজছিলাম এখানে বসে।"

কানু (off voice) ॥ কে ?

শশাংক ॥ একজন। অনেকদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিলো আমার চারপাশ থেকে।

কানু (off voice) ॥ পেয়েছো ?

শশাংক ॥ পাচ্ছি। আস্তে আস্তে।

ক্লোজ আপ :

কানু ॥ রাশুদা মরে গেল কেন ? শশাংক তাকায় কানুর দিকে। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। কোন উত্তর দেয় না। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ভেজানো দরজাটা খুলে বাইরে দেখে।

লং শট : বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়।

মিড শট : শশাংক দেখে। তার পর মুখ ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কানুর দিকে তাকায় বলে—

শশাংক ॥ যাবি ?

সরযূ আসছে বারান্দায়।

হাই অ্যাঙ্গেল শট :

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওপর থেকে সরযূ ওদের দেখে। শশাংকর উদ্দেশ্যে বলে—"কি হল, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ? এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না বুঝি ?"

সরযূর এই অভিমানের অভিনয়ের মধ্যে বেদনার আভাস ফুটে ওঠে। ওরা সরযূর দিকে তাকায়।

কানু ॥ তুমি যাবে ?

[এই বলে কানু শশাংকর দিকে তাকায়।]

শশাংক ॥ যাবে সরযূ ?

[কঠোর হয়ে আসে সরযূর মুখ]

লো অ্যাঙ্গেল শট :

সরযূ ॥ [কানুকে] তোমার আজ যাওয়া হবে না কানু।

কানু ॥ বা রে ! বললেই হলো, তোমার কথাতে বুঝি ?

মিড শট : সরযূ ক্রুদ্ধ ও জলন্ত দৃষ্টিতে একবার ছেলের দিকে তাকায়। তারপর দ্রুত নিজের ঘরে চলে যায়।

cut to

দৃশ্য ২৮ : দিন

একটা কাশবনের মধ্যে দিয়ে (Back to Camera) শশাংক আর কানু হেঁটে আসছে।

cut to

একটা উঁচুনিচু ঢালু জমি। দু'একটা গাছ। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে ওরা।

মিড লং শট :

কানু ॥ গাছেরা তোমার সঙ্গে কথা বলে ?

শশাংক ॥ হ্যাঁ বলে।

কানু ॥ কি বলে ?

শশাংক ॥ বলে শশাংকবাবু—আমাদের মতো হও, রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

কানু ॥ তুমি একটা পাগল। মাটি ? মাটি তোমার সঙ্গে কথা বলে ?

শশাংক ॥ হ্যাঁ। বলে নরম হও। শিকড়গুলোকে আঁকড়ে ধরে জল দাও। বীজ থেকে বিরাট গাছ তৈরী করো।

কানু ॥ তুমি এত শক্ত শক্ত কথা বলো কেন ? সহজ করে, আমি বুঝতে পারি এমন করে কথা বলতে পারো না ?

[শশাংক হাসে, তারপর হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে]

মিড কম্পোজিট শট :

শশাংক ॥ ও ভাই কানাই ; কারে জানাই, দুঃসহ এই দুঃখ। ও ভাই কানাই। এই যাঃ আর মনে নেই !

কানু ॥ তোমার কিসের দুঃখ ?

শশাংক, হাসে এগিয়ে আসে কানাইয়ের কাছে। দু'হাত দিয়ে ওর মুখ ধরে তাকায়।

শশাংক ॥ তুই এখানে একটু দাঁড়া।

লং শট : শশাংক অনেকটা দূরে চলে যায় হাঁটতে হাঁটতে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। আবহে যাত্রার সংগীত শোনা যায়।

এক্সট্রিম লং শট : **শশাংক** ॥ কানু শুনতে পাচ্ছিস ?

মিড শট :

কানু ॥ [চিৎকার করে] হ্যাঁ।

এক্সট্রিম লং শট : শশাংক তারপর তার নিজের নতুন পালার কয়েকটা লাইন চিৎকার করে বলতে বলতে নানান ভঙ্গিতে অভিনয় করে।

"এ এক অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে। ঐ দেখ আশ্চর্য এক অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে। কতদূর নিয়ে যাবে তার মধ্যে দিয়ে, কতদূর ?

কোথাও উত্তর নেই। সাড়া নেই কোন দিকে। কে যেন এসেছে তবু। তার মাঝখানে। আশ্চর্য শ্যামল মধুময়। এ যেন মেঘের পাহাড় ভেঙে এক কণা নীলের ইশারা। [থামে। হাঁপাচ্ছে শশাংক। একটু থেমে—]

মিড শট : **শশাংক** ॥ কানু, আমি আবার পালা লিখবো, দল গড়বো, মণ্টু-

বাবুর পালা কেউ দেখবে না। সবাই তোর আর আমার দলে আসবে। কিরে আসবে তো? কিরে আসবে না? আসবে তো?

কিছুটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আসতে থাকে কথাগুলো।

রিয়্যাকশন শট : ক্লোজ আপ : কানু

কানু উত্তর দেয় না। হাসে। সূর্য ডুবছে দিগন্তে।

cut to

দৃশ্য ২৯ : সন্ধ্যা

ক্যামেরা প্যান করে :

একা সরযূ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একা ঘরে সরযূ আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে যমুনার আলমারি খোলে। তাক ভরে নানান রঙের শাড়ী, ব্লাউজ।

ক্লোজ আপ : সরযূ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই নানান রঙের দিকে।

ক্লোজ আপ : একটা ড্রয়ার খোলে সরযূ, নানান সাজের জিনিষ। যমুনার ফেলে যাওয়া মলজোড়া। আঙুলে নেড়ে নেড়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সব দেখে সরযূ।

তার রিয়্যাকশন শট।

cut to

দৃশ্য ৩০ : সন্ধ্যা

ক্লোজ আপ : যমুনার মল পরে সরযূর দুই পা হেঁটে আসছে বারান্দার ওপর দিয়ে। থামে সরযূর দুই পা। বারান্দায় শশাংক আর কানু, কানু তাকায়। কানু চমকে উঠে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে—"মা!"

শশাংক মুখ তুলে দেখে সরযূকে। শাড়ীর জমকালো রঙে, অলংকারের প্রাচুর্যে, প্রসাধনের অপটু আতিশয্যে সরযূকে অদ্ভুত লাগছে। শশাংক আর কানু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে সেই দিকে।

কম্পোজিট শট : সরযূ একটু মুচকি হেসে বলে—"কোথায় গিয়েছিলে, সিনেমায়?" এরা উত্তর দেয় না।

ক্লোজ আপ :

সরযূ ॥ কি হলো? মুখে যে একেবারে রা নেই? খুব খারাপ লাগছে নাকি দেখতে?

কানু (ক্যামেরার দিকে লং টু ক্লোজ) ছুটে সরযূকে পেরিয়ে ঘরে চলে যায়। সরযূ সেইদিকে তাকায়। তারপর শশাংকর দিকে তাকিয়ে বলে—"বল না গো, নাহলে আমি সব কিন্তু আবার ছেড়ে ছুঁড়ে ফেলবো। তুমি কতবার সাজতে বলেছো। আজ সাজলাম। বল না…"

কম্পোজিট শট : সরযূ আকুল ভাবে শশাংককে বলে।

শশাংক নিজের ঘরে চলে যায়। Camera সরযূর মুখে stay করে।

cut to

দৃশ্য ৩১ : শেষ রাত্রি

ক্যামেরা বাড়ির নিচ থেকে ওপরে উঠে যায়। বারান্দায়। সরযূর ঘরের দরজা খোলা।

ঘরের ভেতর খাটের ওপর সুসজ্জিতা বসে আছে সরযূ।

বিগ ক্লোজ আপ : তার চোখ মুখ ফোলা। কাজল ঘষে গেছে। বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছে সে।

সরযূ উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। দেখে নিজেকে। হাত দিয়ে চোখের তলা মোছে। হাতের চুড়ি নাড়ায়। দেখে পায়ের মলজোড়া। অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে পায়ের মল বাজায়। ক্যামেরা তার পা থেকে মুখে টিল্ট-আপ করে। সরযূ তাকায় খাটে শোওয়া কানুর দিকে।

মিড শট : কানু ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শোয়। জানলাটা খোলে সরযূ। ভোর হয়ে আসছে প্রায়, দু-একটা কাক ডাকছে। কুস্তির পালোয়ান দুজন আসছে।

মিড শট : আখড়ার সামনে এসে তারা হম হম শব্দে উরুর মাংস চাপড়াতে থাকে। সরযূ বেরিয়ে আসে দরজা খুলে। বারান্দা থেকে কুস্তির দৃশ্য দেখে। তারপর মলজোড়া পা এগিয়ে আসে ক্যামেরার দিকে। শশাংকের দরজার সামনে থামে। শশাংকর ঘর, শশাংকর পা থেকে ট্রলি করে ক্যামেরা এগিয়ে যায় শশাংকর মুখের দিকে। সরযূর হাত নেমে আসে শশাংকর গলার ওপর। যেন আস্তে চাপ দেয় সেই হাত। শশাংক উঠে বসে। ঘুম ভাঙে। তাকায় সরযূর দিকে।

মিড শট :

সরযূ ॥ দেখতে এলাম কি সুখে ঘুমোচ্ছে।

শশাংক ॥ তোমার ঘরে যাও।

সরযূ ॥ না।

শশাংক খাট থেকে নামতে যায়। সরযূ ধরে ফেলে শশাংককে।

ক্লোজ আপ :

সরযূ ॥ [চাপা চিৎকার] আমাকে নষ্ট করেছো তুমি, এখন আমি শুনবো না।

শশাংক ॥ তোমরা সবাই আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে।

সরযূ ॥ তুমি তার সবটুকু শোষ তুলেছো।

শশাংক ॥ তোমরা কেউ আমাকে বুঝতে চাও নি।

সরযূ ঝাঁপিয়ে পড়ে শশাংকর শরীরের ওপর।

শশাংক সরযূকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

হঠাৎ দরজাটা অল্প খুলে যায়। দেখা যায় কানুর মুখ। সহসা এই দৃশ্যে সে ভয়ে বেদনায় নীল হয়ে গেছে। শশাংক তাকায় সেই দিকে।

বিগ ক্লোজ আপ :

শশাংক সরযূকে বলে—"কানু"।

সরযূ তাকায়। অদ্ভুত তার দৃষ্টি। কোন ভাবান্তর হয় না তার মুখে কানুকে দেখে।

লং শট : কানু সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। শশাংক এক ঝটকায় সরযূকে ঠেলে দিয়ে খাট থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কানু ছুটে পালাচ্ছে দরজা দিয়ে। শশাংক দ্রুত নামে সিঁড়ি দিয়ে। পেছনে সরযূ ছুটে আসছে শশাংককে ধরার জন্য। ক্যামেরা পেরিয়ে শশাংক চলে যায়।

লং শট : সরযূ ছুটে আসছে। বারান্দা, উঠান পেরিয়ে ছুটে সরযূ গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ক্যামেরা ওর মুখের দিকে এগিয়ে যায়।

বিগ ক্লোজ আপ : হালছাড়া মুখ সরযূর। তার চোখের তারায় জল ভেসে ওঠে, সরযূকে সুন্দর দেখায়। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে সরযূ।

cut to

দৃশ্য ৩২ : ভোর

লং শট টু এক্সট্রিম লং শট :

দেখা যায় উঁচুনিচু এক জলা জমির ওপর দিয়ে কানু ছুটছে। কানুর পেছনে ছুটছে শশাংক। কানু একটু উঁচু ঢালের ওপর ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে যায় নিচে। দেখা যায় না।

শশাংকর মুখ।

লো অ্যাঙ্গেল লং শট :

শশাংক ছুটছে প্রাণপণে, মরিয়া সে। কানুকে সে হারাতে চায় না। কানুকে সে ধরবেই।

শশাংক ক্যামেরার দিকে ছুটে এসে Camera অতিক্রম করে চলে যায় Out of Frame-এ।

এক্সট্রিম লং শট :

পেছনের আকাশে রঙ ধরছে। সূর্য উঠবে। সেই লাল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কানু ক্যামেরার দিক থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে। কাট-টু-কাট করে কানুর কোমর পর্যন্ত শরীর বড় হচ্ছে।

পর্দায় Credit title নিচু থেকে ওপরের দিকে উঠে যেতে শুরু করে।

সমাপ্ত

সংক্রামক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মাথা আঁচড়ে একটি একটি ক'রে কোটের বোতাম এঁটে এবার নিচু হ'য়ে সরযূ ছেলের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছিল, শশাংক এসে ঘরে ঢুকল। মুহূর্তকাল চোখ তেরছা করে সরযূ আর তার ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে শশাংক বলল, 'বাঃ, লাটের বেটার সাজখানা তো আজ দিব্যি মানিয়েছে।'

সরযূ একবার শশাংকর দিকে চেয়ে আবার ফিতে বাঁধায় মন দিল। যেন সে আর তার ছেলে ছাড়া এ ঘরে তৃতীয় কোন মানুষ নেই।

কিন্তু শশাংকর অস্তিত্ব অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার আরম্ভ করল।

'বলি, সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেকে এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় পাঠাচ্ছ সরযূ?'

সরযূ জবাব দিল, 'কোথায় আবার পাঠাব? পার্কে খেলতে যাবে।'

শশাংক একটু হাসল, 'ও তাই বল, আমি ভাবলুম আমাদের কানাই বুঝি সেজে গুজে মজা লুটতে বেরুচ্ছে।'

বিস্ময়ে ক্রোধে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে থেকে সরযূ রুখে উঠল, 'আজ আবার মদ খেয়ে এসেছ বুঝি?'

শশাংক হেসে বলল, 'ক্ষেপেছ, এই মাসের শেষে অত পয়সা কোথায়। বিশ্বাস না হয় মুখ শুঁকে দেখতে পারো'; ব'লে সত্যি সত্যিই শশাংক সরযূর মুখের দিকে মুখ এগিয়ে নিল।

সরযূ সভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, চোখের মাথা একেবারে খেয়েছে। অত বড় ছেলে রয়েছে সামনে, লজ্জাও করে না একটু।'

শশাংক বলল, 'ঠিক ঠিক, লজ্জা করাই তো উচিত। ভুলে গিয়েছিলাম এত বড় ছেলে তোমার সামনে। সত্যিই তো। তাহলে যাও তো বাবা কানাই, জুতোর ফিতে তো তোমার বাঁধা হয়ে গেছে, এবার তুমি বাইরেই যাও, দেখ-না তোমার মা লজ্জায় মরে যাচ্ছে।'

ব'লে শশাংক সত্যিই কানাইয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে অসঙ্কোচে তাকে দোরের

বাইরে ঠেলে দিল, তারপর তার মুখের সামনে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে তক্তপোশের উপর বসল।

কানাই রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বন্ধ দরজায় লাথি মেরে বলল, 'শালা।' ব'লেই তাড়াতাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে গেল, পাছে শশাংক এসে ধরে ফেলে।

শশাংক কিন্তু দোর খুলবার একটুও চেষ্টা না ক'রে বলল, 'শোন একবার, কথা শোন তোমার ছেলের। ন'বছর বয়সেই কি তেজ দেখছ, বড় হ'লে ও যুদ্ধের ক্যাপ্টেন হবে।'

সরযূ বলল, 'হবেই তো।'

শশাংক হাসল, 'ও, সেই ভরসাতেই আছ বুঝি। কিন্তু আর দু' একটা বছর যেতে দাও; সঙ্গে ক'রে নিয়ে পাড়া চিনিয়ে দিয়ে আসব। দেখবে ওর মুখে তখন কি রকম বুলি'; বলে সরযূর থুতনি ধরে শশাংক কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠল, 'রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু', তারপর আচমকা তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল।

সরযূ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছাড়ো, ছাড়ো শিগগির আমাকে। কেন, কি করেছি আমি তোমার, যে দিনের পর দিন ছেলের সামনে আমাকে তুমি এমন করে অপমান করছ। আর ওই এক ফোঁটা ছেলে এত হিংসা তোমার তাকে। তোমার নিজের ছেলে যদি হোত—'

শশাংক বাধা দিয়ে বলল, 'আর সে যদি তোমার বোনের পেটে জন্মাতো তাহলে তুমিও ঠিক এমনই করতে।'

সরযূ বলল, 'তুমি একটা পশু, নর-পিশাচ।'

শশাংক কোন কথা না বলে বিড়ি ধরাল, মেয়েমানুষের এই রুষ্ট বিক্ষুব্ধ রূপ দেখতে তবু এক রকম কিন্তু ওরা যখন পোষমানা বিড়ালের মত কোলের ওপর গা এলিয়ে দেয় তখন শশাংক কিছুতেই যেন তা আর সহ্য করতে পারে না। অথচ প্রথমে যত বিদ্রোহই দেখাক, এক সময় না এক সময় ওরা পোষ মানবেই, এই সরযূই কি কম বাধা দিয়েছে, কম ধস্তাধস্তি করেছে। কিন্তু এখন? একেবারে যেন সাত জন্মের বিয়ে-করা বউ। তার আচরণে কে এখন টের পাবে শশাংক সত্যিই তার পতি নয়, ভগ্নীপতি?

ভায়রা সুখময় তখনো বেঁচে। সেবার সস্ত্রীক ভায়রার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল শশাংক। খাওয়াদাওয়ার পর সরযূ পানের খিলি শশাংকর হাতে তুলে

দিচ্ছে—বলা নেই কওয়া নেই তার আঙুল শুদ্ধ শশাংক খিলিটা চেপে ধরল। যমুনা পাশেই দাঁড়ানো ছিল। রাগে এবং লজ্জায় দুই বোনের সুগৌর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূ ধমকের ভঙ্গীতে বলল, 'ছিঃ, এসব ইতর রসিকতা আমরা একটুও ভালোবাসি না শশাংক। আমি যমুনার বড় বোন। সম্পর্কে তোমার দিদি, ঠাট্টা ইয়ার্কির লোক নয়। যাত্রা থিয়েটারে ঢুকে সভ্যতাভব্যতা একেবারেই বিসর্জন দিয়েছ।'

তারপর এই আট-দশ বছরে কালচক্রের আবর্তনে সংসারে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। যক্ষ্মায় ভুগে এবং চিকিৎসায় সর্বান্ত হয়ে সুখময়ের মৃত্যু হয়েছে। আর স্বামীর অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যমুনা ক'রেছে গৃহত্যাগ।

দুর্ভিক্ষের বছরে ঘটিবাটি যেখানে যা ছিল বিক্রি ক'রেও যখন নিজের আর ছেলের দু'মুঠো ভাত জোগানো অসম্ভব হয়ে উঠল তখন সরযূ অগত্যা শশাংককে তার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখল, 'বলবার তো আর মুখ নেই, হতভাগী সকলের মুখে কালি দিয়ে গেছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার সময় তো এখন নয় ভাই। চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে না খাইয়ে খাইয়ে ছেলেটাকে যদি মেরেই ফেলি তখন তুমিই একদিন বলবে, এমন দশায় পড়েছিলেন দিদি আমাকে না হয় একটা চিঠিই দিতেন। তাই চিঠি দিয়ে অবস্থাটা সব তোমাকে খুলে জানালাম। এখন তোমার ধর্মে কর্মে যা সয় কোরো।'

এমন চিঠি আরো দু' তিনজনকে সরযূ লিখেছিল, লিখেছিল খুড়তুতো ভাইকে, দূর সম্পর্কের এক ভাসুরপোকে আর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। আর কি মনে ক'রে শেষে শশাংককেও লিখেছিল একখানা। কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন জবাব এলো না, জবাব এলো কেবল শশাংকর কাছ থেকে। শশাংক দশ টাকা মনিঅর্ডার ক'রে লিখেছে, এভাবে আলাদা করে টাকা তুলে দেওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সরযূ যদি শশাংকের বাসায় এসে থাকে এবং তার বুড়ো পিসিমার এক-আধটু দেখাশোনা করে তাহ'লে কোন মতে গরিবভাবে সবাই মিলে থাকা যায়। পাড়াপড়শিরা বলল এমন সুযোগ হাত-ছাড়া করা উচিত নয়। কিন্তু শশাংকর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে বড় বদনাম শোনা গেছে যে। পরক্ষণে সরযূ নিজেই নিজের প্রতিবাদ করল। মানুষ কি আর চিরকালই এক রকম থাকে? বয়সের কালে এক-একটু ফচকেমি ফিচলেমি করেছে ব'লে এখনও কি আর শশাংক তাই করবে? তা সরযূরই বা এখন আর ভয়

কিসের, সেও তো এখন কচি মেয়ে নয়, ছেলেই তো তার এই ন' উৎরে দশ বছরে পড়ল, তারপর কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে কত রকম কত সুবিধা সুযোগ জুটে যেতে পারে। আর ছেলেটাকে যদি কোন রকমে মানুষ ক'রে তুলতে পারে তাহ'লে আর দুঃখ কিসের সরযূর। কিন্তু সে সব কথা পরে। এখন সমূহ সমস্যা হ'চ্ছে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার। উপোষ ক'রে ছেলে যদি তার মরেই যায় তা হ'লে এই মান সম্মান ধুয়ে কি জল খাবে সরযূ?

স্টেশনে শশাংক উপস্থিত ছিল। কিন্তু সরযূর চেহারা আর সঙ্গে তার অত বড় ছেলে দেখে শশাংকের সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে এলো। একবার ভাবল এখান থেকেই বিদায় করে, তারপর মনে করল ক'দিন না হয় একটু পরখ ক'রে দেখা যাক আজকাল কতখানি ঠাট্টা ইয়ার্কি হজম করবার সরযূর শক্তি হয়েছে। তাছাড়া যে যমুনা তাকে এমন ভাবে জব্দ ক'রে গেছে তার খানিকটা শোধও তো শশাংক তুলে নিতে পারবে, যমুনার ওপর শোধ তুলবার সুযোগ কি জানি জীবনে যদি একেবারে নাই-ই আসে।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ফ্ল্যাটবাড়িতে শশাংক নিয়ে তুলল সরযূ আর তার ছেলেকে। দুখানা ছোট ছোট থাকবার ঘর, একটা পাকের ঘর, আর একটা বাথরুম। সরযূকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল শশাংক। এত সুখ সুবিধার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু বাদে সরযূ বলল, 'কই, তোমার পিসিমা কোথায় শশাংক? তাঁকে তো দেখছিনে।'

শশাংক মুখ মুচকে হেসে বলল, 'তাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি। বুড়ী ভারী ঝগড়াটে। আপনি তার সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে থাকতে পারতেন না সরযূদি।'

সরযূ বলল, 'এ তোমার কি রকম কথা হ'ল শশাংক। তার সঙ্গে আমার অবনিবনা হওয়ার কি আছে। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।'

শশাংক হেসে বলল, 'করলামই বা, এক-আধটু ঠাট্টা ইয়ার্কি তো আমাদের মধ্যে চলতেই পারে।'

'তোমার পিসিমা তাহ'লে তোমার সঙ্গে এখন থাকেন না?'

'কোন কালেই না। পিসিমা বলেই যে কেউ আমার নেই সরযূদি।'

'তা হ'লে কে এখানে আর থাকতো। বিয়ে-থা তো তারপর আর করোনি শুনেছি।'

শশাংক বলল, 'সে ঠিকই শুনেছেন, যা হয়ে গেল তারপরও আবার বিয়ে?

কিন্তু নিতান্ত মেয়েছেলে না হ'লে নাকি পুরুষের চলে না সেইজন্যই তমাললতাকে কিছুদিন রেখেছিলাম, আপনি আসবেন বলে তাকে বিদায় করেছি।'

সরযূ জিজ্ঞাসা করল, 'তমাললতা আবার কে।'

শশাংক বলল, 'এই পাপমুখে সে কথা বলতে লজ্জা করে। শত হ'লেও তো যমুনার আপনি বড় বোন, সম্পর্কে গুরুজন।'

সরযূ নির্বাক হয়ে গেছে, ইচ্ছা ক'রেছে তখনই ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার ভয়ে বুক কেঁপেছে, কিলবিল করে কেবল অচেনা মানুষ আর মানুষ। কে জানে, এর প্রত্যেকটিই হয়তো একেকজন শশাংক, তার চেয়ে এই চেনা শশাংকই ভালো, যত ঠাট্টা তামাসাই করুক একেবারে যা তা কিছু তো আর করতে পারবে না, গলায় তো ছুরি বসাতে পারবে না আর।

কিন্তু ঠাট্টা তামাসা ধাপের পর ধাপ চড়াতে চড়াতে দু'তিন দিন পরেই শশাংক যখন তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল সরযূ মনে মনে ঠিক করল আর নয় এবার ছেলেকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে, পৃথিবীতে ভয় করবে সে কাকে, কিসের জন্যই বা? আর তার কি অবশিষ্ট আছে হারাবার?

ঘুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে সরযূ চুপে চুপে বলল, 'চল কানাই এখানে আর আমরা থাকব না।'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চলো।'

ছেলের হাত ধ'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একবার সদর দরজা পর্যন্ত এসে থেমে দাঁড়াল সরযূ। অসংখ্য গাড়ী ছুটে চলেছে রাজপথে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের আলোগুলি জলছে রূপকথার রাক্ষসের চোখের মত।

কানাই বলল, 'কই মা, চলো।'

সরযূ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'যাব বাবা, যাব, তুই আর একটু বড় হয়ে নে, তারপর তো যাবই।'

কানাই বলল, 'বড় তো আমি হয়েছি মা।'

সরযূ হেসে বলল, 'আরও একটু বড় হ'তে হবে যে বাবা।'

সরযূ ফিরে এল, সত্যিই তো, হারাবার আর তার কি আছে, ভয় করবার আর তার কি আছে যে সে এমন মরীয়া হয়ে গাড়ী চাপা পড়তে যাচ্ছিল? তার অদৃষ্টে যা হবার তা যখন হয়েছেই তখন এই সুযোগে ছেলেকে কেন বড় ক'রে তুলবে না সরযূ, পরের পয়সায় তাকে মানুষ ক'রে তুলবার সুযোগ কেন আর সে হাতছাড়া করবে?

তারপর বিনা বাধায় বিনা আপত্তিতে সরযূ যখন তার সমস্ত আদর সোহাগ গ্রহণ করল তখন শশাংক নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারল না। এত অল্পতেই যে পোষ মানবে সরযূ তা সে আশা বরং আশঙ্কা করেনি, আর এই নিতান্ত সাধারণ রূপহীনা গতপ্রায়যৌবনা সরযূর মত মেয়ে যদি পোষ মানল, যদি শশাংকর এই সব অবৈধ আদর বৈধ বলেই মেনে নিল তা হ'লে আর রস রইল কোথায়। ঝাঁঝের মধ্যেই তো মদ আর মেয়েমানুষের যত মাধুর্য।

যাকে দিদি বলে ডাকতে হোত গুরুজন বলে সমীহ ক'রে চলতে হোত, এমন কি সময় বিশেষে পা ছুঁয়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে হোত মুখের ওপর তাকে নাম ধরে ডাকতে পারার মধ্যেই একটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার স্বাদ আছে।

সরযূ দু' একদিন মৃদু আপত্তি করে বলেছিল, 'ছিঃ অমন ক'রে নাম ধরে ডেকো না, বড় লজ্জা করে আমার, বরং কানাইয়ের মা ব'লে ডেকো।'

শশাংক জবাব দিয়েছিল, 'সে কানাইয়ের বাবা হ'লে ডাকত।'

আরো কয়েকদিন বাদে সরযূ আবার বলল, 'আচ্ছা নাম ধ'রে ডাকতে চাও ডাক কিন্তু তাই ব'লে কি অত বড় ছেলের সামনেও ডাকবে? শত হ'লে চক্ষুলজ্জা বলেও তো কিছু আছে মানুষের? ন' দশ বছরের ছেলে। ও না বোঝে কি?'

ফলে শশাংক নতুন খেলার সন্ধান পেয়ে গেল, সরযূর যাতে লজ্জা শশাংকর তাতেই আনন্দ। কানাইয়ের কাছে সরযূকে তো সে নাম ধ'রে ডাকেই, মাঝে মাঝে অনুরাগের এমন বাহ্য প্রকাশ করে যে রাগে আর ঈর্ষায় ন' বছরের ছেলে কানাইয়ের চোখ জলতে থাকে আর অসহায় অপমানে আর লজ্জায় আধাবয়সী সরযূর ফ্যাকাসে মুখ রক্তে যেন ফেটে পড়তে চায়, ভারি অপূর্ব দেখতে সে জিনিস, ভারি মজার।

থিয়েটারে পার্ট করে শশাংক, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও নামে, অভিনয়ে তার নাম আছে, আর শুধু যশ নয় টাকাও সে পকেট ভ'রে আনে।

একদিন তার মনে প্রশ্ন এলো এত টাকা দিয়ে করে কি সরযূ, দামী কাপড়-চোপড় গহনাপত্র কিছুতেই সরযূকে পরানো যায়নি, যদি বা শশাংকর জোর জবরদস্তিতে পরেছে কোনদিন তার পরমুহূর্তেই আবার ছেড়ে ফেলেছে। কোনদিন নিজের জন্য কোন জিনিস তাকে আনতে বলে না সরযূ, নিজে হাতে ক'রে যে কেনে তাও নয়। যমুনা, মালতী, যুঁইফুল, তমাললতা সবারই এই বেশবাসের দিকে ঝোঁক ছিল; ব্যতিক্রম কেবল সরযূ।

তারপর একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ্য ক'রতেই অবশ্য টাকার খোঁজ মিলল। ছেলের

জন্য দামী দামী রকম বেরকমের জামা কাপড় জুতো—পাঠ্য বই কয়েকখানা ছাড়াও চমৎকার ছবিওয়ালা সব বই, বাঁধানো মোটা মোটা খাতা, দামী কাঁচের দোয়াতদানি, কলম, রঙীন পেনসিল আর রকমারী সব খেলনায় সরযূর ঘর একেবারে ভ'রে গেছে; খোঁজ নিয়ে জানা গেল সরযূর তত্ত্বাবধানে কানাইয়ের নামে পাড়ারই-ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউন্ট পর্যন্ত আছে।

শশাংক মনে মনে হাসল। তাহ'লে সরযূকে সে যত বোকা ভেবেছিল তা তো সে নয়। শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেকে দিব্যি মানুষ ক'রে তুলছে, কানাই তার একমাত্র আনন্দ; ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা, তারপর একদিন হয়তো এই কানাইকেই সে লেলিয়ে দেবে শশাংকর ওপর, তার সমস্ত অপমানের শোধ তুলবে।

এরপর শশাংক বেশ একটু সতর্ক হয়ে চলতে চেষ্টা করল। টাকা পয়সা আর তেমন ক'রে দেয় না। সামান্য কারণে কানাইয়ের কান ম'লে দেয়, গাল টেনে ধরে। এ যেন দুই নখের মধ্যে টিপে ছারপোকা মারার আনন্দ।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শশাংক পার্টের রিহার্সাল দিচ্ছে হঠাৎ জানালা দিয়ে তার চোখ পড়তেই দেখল কানাই বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকৃত মুখভঙ্গিতে তাকে ভেংচাচ্ছে—দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল শশাংকর।

'তবেরে বাঁদরের বাচ্চা!' ব'লে শশাংক রুদ্রমূর্তিতে ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল, পড়ি কি মরি ক'রে কানাইও দিল ছুট। শশাংক ছুটল তার পিছনে। ধরা পড়বার ভয়ে কানাই দু'তিনটা সিঁড়ি এক লাফে ডিঙাতে চেষ্টা করতেই কি ক'রে তার পা ফসকে গেল এবং গোটা বিশেক সিঁড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে একবারে মাটিতে এসে পড়ল।

গেছে গেছে ক'রে সরযূ এল ছুটে, ততক্ষণে কানাই সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে মাথা থেকে।

এ্যাম্বুলেন্স্ এল, কানাই গেল মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল অবস্থা গুরুতর এরপর সরযূর মুখের দিকে তাকাবার আর সাহস হোল না শশাংকর।

দিন দুই পরে কানাইয়ের জ্ঞান ফিরল, সরযূ আর শশাংক দু'জনেই উৎকণ্ঠিত মুখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

অস্ফুটস্বরে কানাই ডাকল, 'মা!'

সরযূ ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এই যে বাবা।'

কানাই বলল, 'বাবা কোথায়?'

শশাংক এগিয়ে এসে কানাইয়ের বিছানার পাশে বসল, তারপর তার ছোট রোগজীর্ণ হাতখানি নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে বলল, 'কেন বাবা, এই যে আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে তার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে যেন একটা অভূতপূর্ব চমক খেলে গেল।

অপাঙ্গে একবার তাকাল শশাংক সরযূর দিকে, তার জলভরা চোখে লজ্জার এক অপূর্ব রঙ লেগেছে। কানাই বলল, 'আমি বাড়ী যাব।'

শশাংক বলল, 'যাবেই তো, কালই তো তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

কানাই একটু ভীত দৃষ্টিতে শশাংকর দিকে তাকাল, 'আর মারবে না তো?'

শশাংক কানাইয়ের দুর্বল ছোট মুঠিটুকু হাতের মধ্যে চেপে ধরে সস্নেহ হাস্যে বলল, 'দুষ্টু ছেলে! মারব কেন?'

তারপর শশাঙ্ক আর কানাইয়ের অন্তরঙ্গতা দিনের পর দিন এমন গভীর হ'তে লাগল যে সরযূ অবাক হয়ে গেল। কিছুদিন আগেও যে এরা পরস্পরকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখত তা এখন কে বিশ্বাস করবে। শশাংক যেন নতুন জন্ম নিয়েছে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে কানাইকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না। খাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে, শোয়ার সময় পাশে নিয়ে গল্প করে। বেশির ভাগ সময় শশাংকর আজকাল কানাইকে নিয়েই কাটে। সকালে বিকালে পড়তে বসায়। কোন দিন বা নিয়ে যায় সিনেমায়, কোন দিন বা খেলার মাঠে। যেদিন বেরুতে পারে না সেদিন ব'সে ব'সে ছেলেমানুষের মত কানাইয়ের সঙ্গে ক্যারামবোর্ড খেলে।

সরযূ একদিন বলল, 'তোমার হয়েছে কি, আদর দিয়ে দিয়ে যে ছেলেটার মাথা খাচ্ছ।'

শশাংক পরম বিজ্ঞের মত বলল, 'ওটা তোমার ভুল, আদরযত্নে ছেলেরা ভালোই হয়।' তারপর একটু হেসে বলল, 'বিগড়োয় কেবল মেয়েরা।'

সরযূ বলল, 'আহা।'

সেদিন কানাইকে নিয়ে শশাংক সিনেমা দেখতে যাবে। বইখানায় শশাংকরও ভূমিকা আছে। এর আগে সরযূ কোনদিন শশাংকর সঙ্গে সিনেমায় যায়নি, কোথাও বেড়াতেও বের হয় নি। শশাংকর বহু অনুরোধ উপরোধ তিরস্কার ভর্ৎসনাতেও নয়। কোন বড় রকমের বাধা শশাংককে দেওয়ার শক্তি তো নেই,

তবু যে-কোন উপায়ে ছোটখাট ইচ্ছার বিরোধিতা ক'রে সরযূ অপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

কিন্তু আজ যখন কানাইকে নিয়ে শশাংক বেরুবার আয়োজন করেছে সরযূ নিজেই এসে ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়? সব সলা পরামর্শ কেবল ছেলের সঙ্গে! কানু ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে না বুঝি।'

এই অভিমানের অভিনয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনার আভাস ছিল, এমন কি কানাইয়ের কানেও তা ধরা পড়ল। কানাই একবার মার দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর শশাংককে বলল, 'মাকেও নিয়ে চলো বাবা।' বলেই কানাই তাড়াতাড়ি লজ্জায় মুখ ফিরাল। চুক্তিভঙ্গের লজ্জাজনক সম্বোধনটা শশাংক আর কানাইয়ের মধ্যে একটি গোপন রত্নের মত ছিল। সেই গোপনতার মধ্যে কত কৌতুক, কত রহস্য।

শশাংক এক মুহূর্ত সেই লজ্জিত কিশোর কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জার বিচিত্র প্রকাশ শশাংক কত প্রণয়িনীর আনত চোখে আর আরক্ত কপোলে নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, কিন্তু তা কি এত মধুর, এত নয়নাভিরাম?

কানাইকে শশাংক তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তার অপ্রতিভ মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে সরযূর দিকে চেয়ে সকৌতুক হাস্যে বলল, 'আমাদের কানাই মহারাজের যখন আদেশ তখন তো তার মাকে নিতেই হয় সঙ্গে, কি বলো?'

কিন্তু সরযূর চোখে কৌতুকও নেই, আনন্দও নেই, তার দুই চোখে আবার সেই প্রথম দিনের ঘৃণা আর বিদ্বেষ জলজল করে উঠেছে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শশাংকর দিকে তাকিয়ে নীরস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হুঁ, এই সবই বুঝি আজকাল শেখানো হচ্ছে ছেলেকে?' তারপর কানাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'কানাই, সিনেমায় তোমার আজ যাওয়া হবে না।'

কানাই মুখ তুলে মার দিকে তাকাল, 'বাঃ রে, বললেই হোল যাওয়া হবে না। তোমার কথাতেই হবে বুঝি?'

সরযূ ক্রুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'না তা আর হবে কেন? হতভাগা কোথাকার, এখন থেকে তোমার কথাতেই সব হবে।' বলে সরযূ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শশাংক সস্নেহে ধমকে বলল, 'ছিঃ, মার সঙ্গে এমন করে কথা বলে বুঝি? মা হ'ল সকলের চেয়ে গুরুজন জানো না?'

যেতে যেতে কথাটা কানে যাওয়ায় অতি দুঃখেও হাসি পেল সরযূর। ভণ্ডের মুখে মহাভারত। মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে না করবে তাও সরযূর ছেলেকে আজ শশাংকর কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

সরযূ সেই যে গিয়ে ঘরে খিল দিয়েছে অনেক সাধ্যসাধনায়ও শশাংক তা খুলতে পারল না। এদিকে কানাই নাছোড়বান্দা। সে যাবেই, রাগে আর অভিমানে বারবার তার দুটি কোমল সুন্দর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে।

শশাংক অবশেষে বলল, 'আচ্ছা চল।'

বুক ফেটে সরযূর কান্না এল। বহুদিন পরে আজ আবার তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে! অকৃতজ্ঞ ছেলের নির্লজ্জতার লজ্জায়, ধিক্কারে সরযূর ম'রে যেতে ইচ্ছা করল। জাগল একে একে সমস্ত কথা, সমস্ত ইতিহাস তার মনে; দিনের পর দিন কি অত্যাচার, কি লাঞ্ছনা আর অপমানই না শশাংকর কাছ থেকে দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছে সরযূ। একমাত্র ঐ ছেলের দিকে চেয়ে। সে বড় হলে আর কোন দুঃখ থাকবে না সরযূর। জীবনের যত গ্লানি যত লজ্জা সব কানাইয়ের ভক্তি আর ভালোবাসার অজস্র ধারায় নির্মল হয়ে যাবে। আর কেউ না বুঝুক বড় হ'লে কানাই তো বুঝবে সরযূর এই আত্মত্যাগের মূল্য। সে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবে কেবল তার জন্যই সরযূ দিনের পর দিন এই অপমানের দুঃসহ জীবনের ভার বয়ে চলেছে। কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই মরতে সরযূর মন চায় নি।

কিন্তু আজ যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল সরযূর। জলভরা চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে মূর্তি ফুটে উঠল তাতে আঁৎকে উঠল সরযূ। এই তো কেবল শুরু। এরপর একটু বড় হ'লে কানাই মুখের ওপরই তাকে অপমান করা আরম্ভ করবে। আচারে আচরণে চোখের দৃষ্টিতে মুখের ভাষায় মায়ের ওপর তার ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝ'রে ঝ'রে পড়বে। ছি ছি ছি, এমন ভুল কি ক'রে করল সরযূ। কেন তখনই বেরিয়ে গেল না ছেলের হাত ধ'রে। কেন আত্মহত্যা ক'রে মরল না। এত মোহ, এত ভালোবাসা এই ছার জীবনের ওপর!

সরযূর দু চোখ আবার জলে ভ'রে উঠল। ধিক্কারে অনুশোচনায় নিজেকে সে যেন নিশ্চিহ্ন করতে পারলে বাঁচে। এই বছর কয়েকের মধ্যেই ম্লান হয়ে আসা স্বামীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করল, সুখময় যেখানে যে-লোকেই থাক তার

কাছে তো গোপন নেই তাদের ছেলেকে অনাহার থেকে বাঁচাতে গিয়েই সরযূর আজ এই দশা।

শশাংকর বহু অনুরোধ উপরোধে হাতে দু'গাছ করে চুড়ি আর সোনার সরু এক গাছা হার ব্যবহার করা আরম্ভ ক'রেছিল সরযূ। আজ তা খুলে ফেলল, তারপর তার চোখে পড়ল বেশ খানিকটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ী তার পরনে। লজ্জায় ঘৃণায় সরযূর মনে হ'তে লাগল পাড়টাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। শশাংক কিছুতেই সাদা থান পরতে দেবে না। তাই চুল পাড় থেকে ইঞ্চি পাড়, ইঞ্চি পাড় থেকে একরঙা চওড়া লাল কি কালো পেড়ে শাড়ী সরযূকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই অন্য সব দামী নক্সা পাড় শাড়ী শশাংক সরযূকে পরাতে পারে নি। ওইটুকু কৃচ্ছ্রতা ওইটুকু অবাধ্যতা দিয়ে সরযূ নিজের কাজের ন্যায় এবং নীতির খানিকটা মর্যাদা রাখতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু আজ এই লালপাড়টুকু সরযূর কাছে নিজের সমস্ত পরাজয়, সমস্ত অপমানের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল যে, দুখানি সাদা থান সে আসবার সময় নিয়ে এসেছিল তা এখনো আলমারীর এক কোণায় শশাংকর দেওয়া অব্যবহৃত অসংখ্য বিলাস উপকরণের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। সরযূর মনে হ'ল একমাত্র সেই শুভ্র শুচিবাসে তার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত লাঞ্ছনা ঢাকা পড়বে।

সরযূ আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বের ক'রে শশাংকর দামী কাঁচের আলমারী খুলে ফেলল।

তাক ভ'রে রঙবেরঙের শাড়ী আর সেমিজ, ব্লাউজ আর পেটিকোট। এক মুহূর্তে সেই রঙীন বৈচিত্র্যের দিকে সরযূ মুগ্ধ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল, এত রঙ পৃথিবীতে, আর রঙে এত আনন্দ, এতদিন সরযূ কি চোখ বুজে ছিল। ধীরে ধীরে এক একটি ড্রয়ার খুলে ফেলল সরযূ। কোনটিতে অলঙ্কার, কোনটিতে প্রসাধনের নানা মূল্যবান সামগ্রী, এ পর্যন্ত কিছুই সরযূ স্পর্শ করেনি। আজ প্রতিটি জিনিস বার ক'রে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল, সব তার, সব কেবল সরযূর জন্য,—সব, সমস্ত পৃথিবী।

সিনেমা থেকে কানাইকে নিয়ে ফিরে এল শশাংক। উল্লাসে আর আনন্দে কানাই যেন ফেটে পড়ছে!

শশাংক হেসে বলল, 'তা হলে সত্যিই তোর খুব ভালো লেগেছে কানু?'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চমৎকার, আর সাহেবের বেশে এমন মানিয়েছিল

তোমাকে, তারপর তুমি যখন বন্দুক নিয়ে একা একা অমন অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলে আর গুণ্ডাটা লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার পিছু নিল আমি তো ভয়েই অস্থির। এমন বোকা তুমি। গুণ্ডাটাকে তুমি কেন আগেই দেখতে পেলে না আমি তাই ভাবি।'

শশাংক সস্নেহে কানাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মৃদু হাসল। এমন তৃপ্তি এত আনন্দ শশাংক যেন আর কখনো জীবনে পায়নি। কত গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছ থেকে কত অভিনন্দন কত প্রশংসা এসেছে, পাশে বসে কত নারী তাদের অপরূপ বিচিত্র ভঙ্গীতে শশাংকর অভিনয় নৈপুণ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছে, কিন্তু কারো কণ্ঠেই কি এত আন্তরিকতা ছিল, এত মাধুর্য? এর আগে কি কারো দুটি আনন্দোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে শশাংক এমন নিঃসংশয় হতে পেরেছে?

গভীর স্নেহে কানাইকে কোলের মধ্যে টেনে নিল শশাংক, মধুর বাৎসল্যে তার অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ কানাই চমকে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মা।'

শশাংকও মুখ তুলে দেখলে সামনে সরযূ।

কিন্তু একী বেশ তার, সেই পরিচিত অনাড়ম্বর সজ্জা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শাড়ীর জমকালো রঙে, অলঙ্কারের প্রাচুর্যে, প্রসাধনের অপটু আতিশয্যে সরযূকে আর চিনবার জো নেই।

শশাংক আর কানাই দুজনেই বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সরযূ একটু মুচকি হাসল, 'সিনেমা দেখা হয়ে গেল তোমাদের?'

শশাংক বলল, 'হুঁ।'

'তুই কেমন দেখলি রে কানাই?'

কানাই কোন জবাব দিল না, নির্বাক বিস্ময়ে এবং খানিকটা কৌতুক ও কৌতূহলের চোখে সে মাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ছেলের চোখকে অবজ্ঞা করে সরযূ শশাংকর দিকে তাকাল, তারপর প্রগলভ তরল কণ্ঠে বলল, 'কি, মুখে যে একেবারে রা নেই। খুব খারাপ লাগছে নাকি দেখতে?'

শশাংক ইঙ্গিতে একবার কানাইকে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ ওর উপস্থিতিতে এসব প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়।

কিন্তু সরযূর কোন দিকে কোন খেয়াল নেই, সে যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে জীবনে, নতুন নেশা।

সরযূ তেমনি তরল স্বরে বলল, 'বাঃরে, এতদিন পরে তোমার পছন্দ মত করে সাজলুম, একবার মুখ ফুটে বলবেও না কেমন লাগছে।'

শশাংক বিব্রত এবং বিমূঢ় ভাবে সরযূর দিকে তাকাল। হঠাৎ কি হয়েছে সরযূর? টনিকের বদলে ভুল করে অন্য কিছু খেয়ে বসেনি তো? কিন্তু ভুল করবার মেয়ে তো সরযূ নয়, যদি করে থাকে ইচ্ছা করেই করেছে, কিন্তু কেন হঠাৎ এমন দুর্মতি হল সরযূর?

সরযূ এবার এগিয়ে এসে শশাংকর হাত ধরে আস্তে একটু নাড়া দিল, 'বলো না গো, না হলে আমি সব কিন্তু আবার ছেড়েছুড়ে ফেলব।'

শশাংক এবার কানাইয়ের দিকে তাকাল, 'যাও তো কানাই, ওঘরে গিয়ে ছবির এ্যালবামটা দেখতো ততক্ষণ, আমি এখুনি আসছি।'

সরযূ খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ওমা, তাই বল, কানুকে দেখে তোমার এত লজ্জা, আহা-হা, ও যেন আর জানেই না কিছু। মিটমিটে শয়তান।'

[প্রথম প্রকাশ : অলকা পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৫২। রচনাকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২]

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র 'ফেরা'

আলোক সরকার

সংযুক্ত হবার আর্তি যেখানে আকাঙ্ক্ষিত আধার পেয়েছে, অন্তত পাবার চেষ্টা করেছে তা কোনো প্রাকৃতিক সচেতনা নয়, তা স্পষ্টতই ভাবময়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'ফেরা' দেখার পর এটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, সবচেয়ে বড় বার্তা। রাশু যার কাছে সর্বত উন্মোচিত হয়, হতে পারে, সেই কল্যাণী বোবা এবং যেহেতু বোবা সাধারণত বধিরও নিশ্চয়। শশাংক যার ভিতর সহৃদয়তা এবং প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পায় সেই কিশোরের যেমন কোনো পূর্বলব্ধ সংস্কার নেই, সেইরকম অভিজ্ঞতা অথবা বহিরাগত বীক্ষণ। প্রথম অকলুষ প্রাকৃত সংবেদন—শিল্পের অভিনিবেশ সেইখানেই বেজে উঠল। আর সবই পাথরপ্রতিম মূঢ়তা, স্বার্থকেন্দ্রিক অন্ধ আবর্তন—কল্যাণীর মৃত্যুর পর রাশু তাই এই সব নিয়ম-নিরুদ্ধ বাস্তবিকতার উর্ধ্বে অনেক উর্ধ্বে উঠে অমূর্ত কল্যাণীকে স্পষ্ট করে চিনতে পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধতা। কিশোর অর্থাৎ প্রথম অকলুষ বোধের ভেতরই ধ্বনিত হয়ে উঠবে শিল্প-কল্পনা। প্রতিধ্বনি শোনা নাকি আশ্রিত হবার প্রয়োজনেই তাকে চাওয়া; তাকে পাওয়ার মধ্যেই আবার ফিরে-আসা শিল্পের কাছে, সব ঘৃণা বিদ্বেষ তুচ্ছতার উর্ধ্বে শিল্পের আনন্দ আলয়ে। সঙ্গহীন তাৎপর্যহীন রাশুর জীবন গীতিময় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে কল্যাণীর কছে এসে, যে মূক কেবল নিস্তব্ধ ইঙ্গিতময় উত্তর দিতে জানে। ভালোবাসার কোনো শরীর নেই, শিল্পের কোনো শরীর নেই, অশরীর—তা কেবল তাৎপর্যময় ইঙ্গিতময় অভিভাবে ক্রমসন্নিবিষ্ট হয় আর এক অমূর্ত উজ্জীবনী জাগরণের মধ্যে। এক অমূর্ত অন্য অমূর্ততার ভেতর সম্পূর্ণতা পায়।

অবশ্য এ-সমস্ত কথাই অবান্তর মনে হতে পারে, মনে হতে পারে যে কোনো শিল্পেরই সার্থকতা যেখানে তার সম্পূর্ণতার ভিতর, তখন তার উপকরণ বিষয়নিবেশী আলোচনা অপ্রয়োজনের। সত্যজিৎ রায়ের অবিস্মরণীয় শিল্পকর্মগুলির বিষয়-মাহাত্ম্য নিয়ে কে ভাবে, বস্তুত বিষয়-মাহাত্ম্য সেখানে অবশ্যই গৌণ—পথের পাঁচালী এক শিল্পীত অভিভাব এবং তার বেশি আর কিছুই নয়, এক নিবিড় নিটোল সম্পূর্ণতা। যেমন একেবারে শেষের দিকে পিকু। পথের পাঁচালী অথবা পিকুর শিল্পসম্পূর্ণতা অনিঃশেষ জাগরণ ঘটায়, তারা বস্তুত কিছুই বলে না, বেজে

ওঠে ; বুদ্ধদেবের 'ফেরা' কিছু বলার ভেতর দিয়ে বেজে ওঠে। সেই বলা আবহমান ব্যক্তিমানুষ আর তার অভিব্যক্ত হওয়ার আকৃতি। 'ফেরা'র শিল্পসম্পূর্ণতা মননিবেশী সম্পূর্ণতা, বলা যেতেই পারে তা এক আধ্যাত্মিক এককতা ; যে সমগ্রতা তার অন্বিষ্ট তা শিল্পগত অভিনিবেশের পাশাপাশি এমন এক জাগ্রত আঁধার নিয়তি আমাদের সামনে আনে যেখানে আবহমানের একক বিচ্ছিন্ন মানুষ অনন্ত সময়ের ভিতর অখণ্ডতা পায়।

ফেরা প্রসঙ্গে

ভাস্কর চক্রবর্তী

মাঝপথে পথ হারিয়ে ফেলার ঘটনা সাহিত্যে, জীবনে, একাকার হয়ে আছে। আমরা যারা শিল্প-সাহিত্যকে একটু-বা বেশীই ভালোবেসে ফেলেছি, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে সামান্য একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছি, মোহ আর মোহহীনতার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি কখনও—আমাদের বিপদও যে মাঝপথে সম্পূর্ণ এক আত্মঘাতী পথ দিয়ে এসে কামড়ে ধরে থাকে আমাদের বোধ, ভালোবাসা আর দায়িত্বকে—তার থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা ক'জনই বা পারি—শশাংকর মতো কাজকর্মে, চিন্তাভাবনা আর ভালোবাসার পথে ফিরে এসে দাঁড়াতে?—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর এই নতুন ছবি 'ফেরা'-য় সেই আমাদের কথাই বলেছেন। আমরা যারা আমাদেরই মাংসের টুকরো প্রিয়জনকে অনায়াসে খুবলে নিতে দেখে বিস্ময়ে ব্যথা-বেদনায় ছিটকে যাই পথ থেকে, ঘরে হঠাৎই-বা বিষের ভাণ্ডার দেখে বিভ্রান্ত হই আর পথ হারিয়ে ভুলে যাই কী যেন 'ধনুকের ছিলা রাখে টান'…, হাজার মাইল মনের কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে—সমসময়ে যখন অন্ধকার সরু গলি দিয়ে দুপুর-রাত্তিরে শুধু অনবরতই দৌড়ে-যাওয়া পায়ের শব্দ, যখন ভয় হয় হয়তো মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে লম্বা কোনো মৃত তিমির কঙ্কাল, কোনো 'হৃদয়বিহীন প্রেত'—অন্ধসময়কে ছিঁড়ে আমরা সকলেই কাজের মধ্যে ফিরে আসতে পারি না, কিন্তু স্বস্তি আর সান্ত্বনা এই যে, আমাদেরই শশাংক তা পেরেছে।

বুদ্ধদেব-এর 'ফেরা' এক বিরল সাধারণতার ঝলকানি, এক সার্বজনীনতার

আভা। কীভাবে আমরা পথ হাঁটি? কেন আমরা আবিষ্কার করতে পারি না আমাদেরই পাশের—বুদ্ধিমান হওয়ার যাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই—ধর্মরাজের মতো শিক্ষিত সরল চেতনাময় রাশুকে? আমাদের আনন্দ এইটুকুই, রাশুকে আবিষ্কার করে শশাংক পুনরাবিষ্কার করেছে নিজেকেই আর পেয়েছে নতুন রক্তের এমনই এক কিশোর সঙ্গী যাকে সে আন্তরিকভাবে বলতে পারে :

I
want you
to listen
to
me
it is growing dark' *

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর Film-এর কথা ভাবলে Holan-এর কবিতার অবিখ্যাত এক পঙ্‌ক্তি 'Life is not a straight line' আমার বারবারই মনে পড়ে যায়। জীবনের কান্না, হাহাকার, ক্রোধ আর আনন্দ—'ফেরা'য়—এক চমৎকার কারিগরীতে প্রায় স্তব্ধ হয়ে আছে। বুদ্ধদেব ভালো Film করেন এ কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু কলমকে সরিয়ে রেখে কবি বুদ্ধদেব যখন Film-এ অধিকতর মনোনিবেশে ব্যস্ত আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করতে থাকবো অবিস্মরণীয় আরো কিছু—চিরকালীন কয়েকটা Film, যে সব Film দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই মনে পড়বে না আমাদের কোনো কোনো বিদেশী Film-এর টুকরো দৃশ্য—যা নিয়ে আমরা সহজে, আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে থাকবো আজীবন, যা নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা সাবলীলভাবে কথা বলতে থাকবে সময় থেকে সময়ান্তরে।

* Kenneth Patchen

১৮-১২-'৮৭

সুধেন্দু মল্লিকের নয়টি কবিতা

সখা হে

হাত ছেড়ে তোমার পা ধরেছি। সখা হে!
বড়ো অন্ধকার। যেয়ো না।
কিন্তু এও তো বাধা যে বাধায় থেমে যাও
যে বাধা থামায় তোমাকে।
তাই পাও ছাড়লাম। চলে গেল শ্যামদায়ায়
যুগল তরণী। আমি হাসলাম।

সখা হে! জানি না কেন এমন করছি।
চিরকাল তো এমনি করেই উড়ে যায় পাখি
ভেসে যায় মেঘ মিলিয়ে যায় আলো।
যা স্তব্ধ তাই মৃত নয়
যা নিশ্চল তাই শেষ নয়।
তাই চলেছি। নৌকোর পিছনে জল রেখার মতো
অন্ধকার আমাকে বন্দী করতে পারে
কিন্তু অন্ধ করতে পারে না। সখা হে!
যাচ্ছো তো? কেমন চলেছো!

পায়েস

কি সুন্দর পায়েসের গন্ধ আজ
বাতাসে বাতাসে ভেসে যায়।
অনন্ত স্ফটিক নীল পাত্রের কানায় কানায়
যেন উপচে পড়বে ধূমশুভ্র পায়েস।

আমরা সব কাতর ভিখিরি। পিঁপড়ের মতো
খুদে খুদে চোখ তুলে চেয়ে দেখছি অবাক
কার জন্যে ওই পায়েসের বাটি।
এক ফোঁটাও নিচে পড়ছে না।
কে খায় ওই অফুরন্ত মেঘের পায়েস!
আশ্চর্য জঠর তার! ধন্য তার তৃপ্তিভরা মুখ।

আমাদের পণ্ডিত মশাই (অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর
পড়েছেনও বিস্তর) নদীর পা ডোবানো জলে
মুখটুখ ধুয়ে বল্লেন—সোনার চাঁদেরা শোনো
শাস্ত্রে বলে এর নাম পুরুষ আর ওর নাম মায়া!

কিছু না বুঝেই আমরা সকলে গন্ধদাস
হাঁ করে তাকিয়ে শুধু পায়েসের স্তূপ দেখতে লাগলাম।

ও মুখ

চোখের বিদ্যুৎ কণা জলে ওঠে
ও মুখ তখনি স্পষ্ট হয়।
না হলে তো অন্ধকার। কে কোথায়
ছড়িয়ে রয়েছি কতো দূরে।
পরান বন্ধুরে বলে গান ধরে মাঝি।
সেই সুর গলে যায় রজত ধারায়।
বন্ধু কি দিয়েছে সাড়া ডাকে!
শুধোতে যাবার আগে তরণী অদৃশ্য হয়
নীলাঞ্জন বাঁকে।

যে পেয়েছে তাকে তো চিনি না আমি
যে পায়নি তাকেও জানি না।

আকাশ নক্ষত্র জেলে বসে থাকে সারারাত
ভোরের হাওয়ায়
আলো নিভে যায়।

কে নেভালো সাধের প্রদীপ! মুখ তার
ম্লান হয়ে আসে অভিমানে। মেঘ জমে
থির থির করে কাঁপে ঘাস।
এত অবিশ্বাস। এত ভয়!
চোখের বিদ্যুৎ কণা জলে ওঠে
—তখনি ও মুখ স্পষ্ট হয়।

অতিথি

তুমি যেন বিশেষ অতিথি। দূর বিদেশ হতে
আসছো খবর পাঠিয়েছো। আসছো
আমারই বাড়িতে।
সে কি উত্তেজনা। কি কোলাহল
সরব! কে তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে আসবে
ঘরে, কোথায় বসাবে, কে দেবে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল
বরফমুখর পানীয় স্মিত হেসে, কি বলবো
কি শুনবো! চারিদিকে চাকভ্রষ্ট মৌমাছি
উড়ে বেড়ায় পুষ্প বীতরাগ।

আজ সেই দিন। দমবন্ধ আনন্দ চেয়ে রয়েছে
কেবল দরজার দিকে। সমস্ত শব্দ আজ করাঘাত
করছে শ্রবণে, দেখলাম কতো সামান্য স্পর্শে
কেঁপে উঠছে অস্তিত্ব। এই প্রথম অনুভব করলাম
অপেক্ষার দিন কি দীর্ঘ। দিনের অন্তরে যে

প্রতীক্ষা সে অতিক্রম করে যায় সমস্ত দিনকে
ক্লান্ত অসুখের মতো।
একটা মুহূর্ত আসে যখন সব শব্দ থেমে যায়
সে আরো তুমুল কোলাহল আমাদের হৃদয় স্পন্দন।
তখন শুধু দেয়ালে পতঙ্গের মলিন ছায়া।
ফুলদানিতে নতশির সকালের গর্বিত গোলাপ।
হে বিদেশের আশ্চর্য অতিথি
আসবো বলো। প্রস্তুত করো।
কখনো আসো না।

শান্ত

আমিই তোমার অশান্তি অস্থিরতা দ্বিধায়
দ্বিমুখ সময় দিন আর রাত্রি।
আমি স্থির বসে আছি, আমাকে নিয়ে চলেছো
তুমি অধীর ট্রেনের মতো।
আমি অব্যাকুল। জন্মের প্রকাশ হতে
মৃত্যুর গোপনে আমাকে বারবার টেনে ছুড়ে ফেলে
তুমি কি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছো বালক?
আমি তোমাকে বালক বলতেই পারি কারণ
বালকেরই মতো ব্যস্ত তুমি।

তুমি কি জানো না আসলে তোমারই জন্ম
তোমারই মৃত্যু। সমস্ত পরিবর্তনে যে চূর্ণ হয়ে
গেছে সে তুমিই। আমাকে প্রদক্ষিণ করো।
জানো আমি তোমার অতীত।
যা অতীত তাই শান্ত।

আংটি

পড়ন্ত বেলায় মাঠভরা পাকা ধানের গাছ
যেন সোনার আংটি।
তার ঠিক মাঝখানে রক্তলাল চুণি
দিনমণি। কার বাগদত্ত এই আভরণ।
এখন ঈশ্বর এলেন। রাঙা মেঘের পোষাক চৌষাক পরে।
হাসতে হাসতে বাড়িয়ে দিলেন আঙুল।
না। না। সব তোমাকেই বা দেবো কেন ?

নদীর ভেতরে চমকের মতো ঝলসে উঠলো
রজত রোহিত বল্লো দাও আমাকে, রেখে
দিই আমার জঠরে অযুত নিযুত বছর পর
যে দাঁড়াবে বিরহ বেদনে তার মুখ চিনে
নিতে আমাকে ডেকো এই তরঙ্গ তীর্থে।
না এ আংটি তোমাকেও দেয়া যাবে না হে বিস্মৃতি !

বাঁধের ধারে কাঁদছিলো নগ্ন এক বালক।
আমি বল্লাম এই ছেলে আংটি পরবি, তো
আয়।
তার কান্নার মুখে আলো ফেললো
অবাক হাসি।
এগিয়ে এলো বালক। আরো কাছে।
এগিয়ে গেল কবি। আরো কাছে।

ঝড়

এভাবে আসবো না আমি আর।
এভাবে দেখবো না ঘরবাড়ি। জগৎ সংসার।
সব কিছু বদলে ফেলবো পদ ভঙ্গি

চেয়ে থাকা বিলাস উচ্ছ্বাস ব্যাকুলতা
এমন কি সামান্য এই হেসে উঠে
পথে গিয়ে নামা—
এ সবও থাকবে না।
দেয়াল ভাঙার পর অবশিষ্ট যদি থাকে ঘরে
হয়তো ঝড়ের পর তাই থাকে বালুর অন্তরে।
আমি তো জানি না ঠিক
কি থাকবে, কি হবে তখন
বৃষ্টির ফোঁটার মালা ঝরে যেতে
যেটুকু সময় লাগে
তার মধ্যে হয়ে যাবে হৃদয়ের সাম্রাজ্য পতন।

দেয়ালি

আকাশে হাত যায় না বলে দুঃখ হয় না
সে তো অনেক দূরে চেয়ে আছে।
আমার চোখে চোখ পড়তে পড়তে
অন্ধকার হয়ে যাবো।
ছাখো গাছের ওই পাতাটাও কত উঁচুতে—
কিছুতেই হাত যায় না। তার ওপরে আকাশ
আর সেখানেই যত কুসুম।

চারপাশে তো কেবল তোমারই খবর।
তুমি আসছো তুমি এসেছিলে তুমি আসবে।
তাই কেউ আনন্দিত, কেউ নিদ্রিত কেউ জাগ্রত।
এই তো ভালোবাসা আর ভালোবাসার কথা।
রাত্রি নামছে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে।
উঠে যাওয়া সিঁড়িতে তার ছায়া। ভালোবাসা যেন
এক গোছা লাল সাদা হলুদ সবুজ নীল সাতরঙ
মোমবাতি। বুকে আঁকড়ে বসে আছে বালক।
কিছুতে জ্বালায় না।

প্রবেশ নিষেধ

তুমি তো জানোই বাগানের গাছে
ফুলেরা ভালোই থাকে।
দিনে রাতে রোদ্দুরে বর্ষায়
ফুলেরা প্রেমের স্পর্শ পায়।
কিন্তু তুমি ঘরও ভালোবাসো।
তাই লুব্ধ হাতে কিছু ফুল তুলে এনে দ্রুত
রাখো জানালায়।
ফুলেরা শুকিয়ে যায় তবু। তুমি ভাবো প্রেমে
কিছু ফাঁকি
ছিল নাকি! যত্ন ছিল জল ছিল ছায়া ছিল
সর্বোপরি ছিল প্রসাধন। ওই ছমছাড়া গাছ
কতটুকু বোঝে নান্দনিক মূল্য কিংবা কুসুমের
ব্যবহার!
তবুও ঝলসে গেল মুহূর্তেই চারুশিল্প
কর্তৃত্বের অহংকার; অতি স্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন।
কেননা নিষিদ্ধ কিনা বাগান ও ঘরের মধ্যে
ফুলেদের গমনাগমন।

সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা

রাণা চট্টোপাধ্যায়

সুধেন্দু মল্লিকের ন'টি কবিতা নিয়ে সামান্য আলোচনা করার আগে আমি বুঝতে চাইব তিনি কি রকম কবি? পঞ্চাশ দশকের জনপ্রিয়তম কবিদের পাশাপাশি আমরা কি তাঁর নাম উচ্চারণ করে থাকি? পঞ্চাশ দশকের মধ্যসময় থেকে যে কয়কজন শান্ত ও নির্জন কবি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর কবিতায় বরাবরই নিঃসঙ্গতার বেদনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধের কথা তিনি কবিতায় বারবার জানিয়েছেন। তিনি বিশুদ্ধ ঘরানার কবি হয়েও শেষপর্যন্ত মানুষের স্বপক্ষে বারবার ঘোষণা করেছেন—

"সব কবিদের নয় কোন কোন অনার্ত কবির
কিছুই থাকে না—
বিপুলতা সফলতা সোনার ওজনে। সে কবিই
যেতে পারে চলে যেতে পারে
এমন উজ্জ্বল অগ্রাহ্য ব্যথিত গাছের ছায়ায়"··· (কবির বিদায়)
(কবিতা কলকাতা, বইমেলা ১৯৮৭ সংখ্যা)

তাঁর "বৃষ্টিকে করেছো বৃষ্টি" বা "কেয়াকে সর্বস্ব" কাব্যগ্রন্থে প্রেম ও প্রেমের নিবেদনটুকু বেদনাভারাক্রান্ত বিষাদরসে আক্রান্ত। আমি খুবই অবাক হই যখন কোন তরুণ কবির মুখে শুনি সুধেন্দু মল্লিক কত বড়ো কবি জানেন? আমরা তো তেমন কিছু পড়িনি। হায়, বিজ্ঞাপন! হায়, নিয়ন আলো! সুধেন্দু মল্লিকের মতোন একজন বিশিষ্ট কবিকেও কত অবহেলা ও অনাদর পেতে হয়। তাঁর উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থ দু'টি যাঁরা পড়েননি বা সে-কবিতাগুলির রস আস্বাদন করেননি, তাঁরা বাঙলা কবিতার একটি উজ্জ্বল অথচ শান্ত সমাহিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাননি। আমি অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা না উল্লেখ করে থাকতে পারছি না যে পঞ্চাশের যাঁরা বিখ্যাত কবি বলে স্বীকৃত তাঁরা কিন্তু অনেকেই তাঁদের প্রথম যৌবনের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থগুলির দু-একটি এই বিশিষ্ট কবিকে উৎসর্গ করেছিলেন।

সুধেন্দু মল্লিকের কবিতার অন্তর্নিহিত জগৎ মধ্যসত্তর থেকে ঈশ্বর ভাবনায়

স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করলো। অকৃতদার এই কবির মানসিক বলয় নিভৃত ও নির্জনে, আধ্যাত্মিক ভাবনায় পরিপূর্ণতা লাভ করলো। যদিও বাঙলা কবিতায় অধ্যাত্মবাদ কোন নতুন সংযোজন নয়। পূর্বাপর বহু বিখ্যাত কবির ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম, কখনো ঈশ্বরে কখনো ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে আধ্যাত্মিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আমরা বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে কুমুদরঞ্জন মল্লিক অবধি এসে যদি একটি পর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করি। (যেখানে ওপার বাংলার দু'একজন কবির সুফীবাদ চর্চা মনে রেখেই একথা উল্লেখ করছি।) এবং অধ্যাত্মবাদ বা অতিপ্রাকৃত (Metaphysics) প্রত্যাশা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে ধরে নিই তাহলে পরম ভুল করব। বস্তুত, ধর্মতত্ত্ব কবিতার মোড়কে মাঝে মাঝেই ধরা দিয়েছে। বাঙলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্য মূলত ধর্মনির্ভর। সেখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম থেকে কালীকীর্তন, আল্লা থেকে শঙ্করপ্রভু কেউই বাদ যায়নি বিষয় হিসেবে। বিশ্বসাহিত্যেও ধর্ম সব সময়ই বিষয় হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, প্রাধান্য পেয়েছে।

বাঙলা কবিতায় এই ধর্মধারার নিভৃত চর্চা মাঝেমাঝেই চমকে দিয়েছে আমাদের। শ্রীঅরবিন্দ বা স্বামী বিবেকানন্দর কবিতা যাঁরা পড়েছেন, বা পরবর্তীকালে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কিংবা মৃণালকান্তির কবিতার ভেতর তাঁরা অধ্যাত্ম-ভাবনার উন্মেষ দেখেছেন। তবে, কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সচরাচর এঁদের উল্লেখ করি না। কারণ, কবি হিসাবে এঁরা স্বীকৃত নন, যত ধর্মগুরু হিসাবে। এই ধারার প্রকৃত কবিদের ভেতর প্রথম-জন যদি "অলকানন্দা"র কবি নিশিকান্ত ধরে নিই, দ্বিতীয়জন নিশ্চয়ই "সঙ্গে আমার বালক কৃষ্ণ'র কবি সুধেন্দু মল্লিক।

সুধেন্দু মল্লিক প্রকৃত কবি। তাই, তাঁর অধ্যাত্মবোধও আমাদের জাগ্রত করে। তিনি সম্প্রতি নিজের কবিতার কথা বলতে গিয়ে বিরলদৃষ্ট গদ্যে জানিয়েছেন, "দিনের পর দিন পিতামহ (কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক)কে দেখেছি ভাবের রাজ্যে থাকতে। তাঁর কবিতা আমার মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে শিশুকাল থেকে। তাঁর জীবন ও কবিতা লেখা নদী—সব নদীর তরঙ্গের মতো। তাঁকে তুমি (বর্তমান নিবন্ধকার) ছাখোনি। জানি না তাঁর লেখা বিশেষভাবে পড়েছো কিনা। তাই তোমাকে বলছি আমার লেখার মূলসূত্রটি তাঁর থেকেই উত্থিত। খুব ছোটবেলা থেকে আমি কবিতা লিখছি। আমি খুব ভাল ছাত্র কোনদিনই ছিলাম না। খেলাধুলোয় উৎসাহ আমার কস্মিনকালে নেই। অন্তরঙ্গ সঙ্গীদলও

আমার নেই—ছিলোও না। আমি প্রকৃতিকে ভালবাসতাম। ঈশ্বরকে ধারণা করার চেষ্টা করতাম।" (জিগীষা, ২৭ সংকলন)

বস্তুত, ঈশ্বর কি? যাঁকে সুধেন্দুমল্লিক ঈশ্বর বলছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'জীবন দেবতা' বলেছেন। সুধেন্দু মল্লিকের বর্তমান এই ন'টি কবিতা পড়ার পর আমার মনে হয়েছে ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও যে চেতনার একটি মাহাত্ম্য আছে, পূর্ণানন্দ ভাব আছে যা আমাদের হৃদয় মনকে কোন সীমারেখার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। প্রথম কবিতা "সখা হে" এর মধ্যে তার চূড়ান্ত বিকাশ দেখি।

"হাত ছেড়ে তোমার পা ধরেছি। সখা হে।
বড়ো অন্ধকার। যেয়ো না
কিন্তু এও তো বাধা যে বাধায় থেমে যাও
যে বাধা থামায় তোমাকে।"

নিখিল চরাচরের এই রহস্য, এই অপূর্ণ মনুষ্যত্ব তার পূর্ণতা কিসে হয়? এই জানার জন্য সর্বংসহ বসে থাকা। হয়তো কবি বলতে পারেন "তাই চলেছি, নৌকোর পিছনে জলরেখার মতো / অন্ধকার আমাকে বন্দী করতে পারে / কিন্তু অন্ধ করতে পারে না।"

বস্তুত, সুধেন্দু মল্লিকের কবিতার-আত্মার সন্ধান করতে গেলে এক অনিবার্য মানুষের নিগূঢ় স্বধর্মরক্ষার কথা ভাবতে হয়। দ্বিতীয় কবিতা "পায়েস" এই সিরিজের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। সুধেন্দু মল্লিক এই কবিতার ভেতর সচেতন ও অচেতন, বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ও পরাবাস্তবের মিলন ঘটিয়েছেন। ঈশ্বরের বোধ, সংসারের যাবতীয় মায়ায় আচ্ছন্ন আমাদের জ্ঞান নামক নিগূঢ় আনন্দকে চিনতে দেয় না।

"কে খায় ওই অফুরন্ত মেঘের পায়েস!
আশ্চর্য জঠর তার। ধন্য তার তৃপ্তি ভরা মুখ।"

কবি আমাদের নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের ভেতর এমন এক আলোকের সন্ধান দিয়েছেন যা শাশ্বত ও ধ্রুপদী। প্রত্যেকটি কবিতাই তাই শেষপর্যন্ত এক অচেনা জগতের দ্বার খুলে দেয়। আধ্যাত্মিকতা তাঁর কবিতার রোমান্টিক বাতাবরণে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আমাদের মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব সাহিত্যের সেই সহজিয়া সাধনার কথা। প্রকৃতি ও মানুষের দোলাচলে জীবন নামক মিশ্রিত অনুভূতি। কবি কিছুই তেমন বলেন না আবার বলে দেন "খাঁচার ভেতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়।" সেই অনিবার্যতত্ত্ব।

"তুমি যেন বিশেষ অতিথি। দূর বিদেশ হতে
আসছো খবর পাঠিয়েছো। আসছো
আমারই বাড়িতে।"

কিন্তু সে তো আসে না। বেকেটের "ওয়েটিঙ ফর গোডো'র সেই প্রতীক্ষা। বসে থাকা অনন্ত কাল। সুধেন্দু মল্লিকের ভাষায়—"হে বিদেশের আশ্চর্য অতিথি / আসবো বলো। প্রস্তুত করো। / কখনো আসো না।"

সবকটি কবিতাই অনবদ্য। এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কবিতার অন্তরালের অসীম বিস্তারের কথা নিয়ে অনেক বড়ো প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। আমি মনে করি, তাহলে, পাঠকের সঙ্গে তঞ্চকতা করা হয়। 'পায়েসের' স্বাদ অন্যের জিভে কতখানি মিষ্ট লাগে? নিজের জিভে স্বাদ নিতে হয়। আমি আংশিক-ভাবে কবির মানসিকতা ধরাতে সাহায্য করতে পারি কিন্তু কবির আত্মস্বজন নিজ নিজ কল্পনার স্পর্শে তার মূলদেশে পৌঁছানোর খবর পাঠক নিজেই খুঁজে নিন। এই কবিতাগুলি পড়ে পাঠক নিশ্চিত ভাবে কবির বিদ্যুত আলোকস্পর্শে বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন আশা রাখি। আমি নিজেও ভাল কবিতা নিয়ে অনর্থক উপক্রমণিকা করা থেকে বিরত থাকাকে অধিক শ্রেয়স্কর মনে করি। কবিতা, কবির মনের দর্পণ। ন'টি আশ্চর্য কবিতা পড়ে আমার মন আপাতত শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। আমার এই তো পরমলাভ।

দিল্লীকা লাড্ডু

হিমানীশ গোস্বামী

সংবাদ কাকে বলে?

সংবাদ কি তা নিয়ে টিভির জীবন-দর্শনের কর্মকারকদের বা স্থপতিদের মনে কোনও দ্বিধা নেই। যেখানে সত্যমেব জয়তে নয়, সত্যমেব রাজীব! এবং রাজীবম-ই সুন্দরম্! রাজীব প্রধানমন্ত্রী অতএব তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাও ফেলনা হতে পারে না হওয়া উচিতও নয়, কিন্তু যিনি সব সময়েই কথা বলতে ভালবাসেন এবং প্রায় একই কথা বলতে ভাল-বাসেন তাঁর কথার মূল্য কতখানি হতে পারে? প্রথম দিনে যে কথা 'সংবাদ' পরের দিন সেই কথাই আর সংবাদ নয়। বার্তা সম্পাদককে সেজন্য সতর্ক থাকতে হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক একই কথা যাতে বারবার না প্রকাশিত হয় তার উপর নজর রাখেন। "ভারত আজ সংকটের মুখে" এই কথাটি আর সংবাদ নয়—কেননা, কথাটি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত ৪৮২১২ বার বড় বড় বাঘা বাঘা ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত, ব্যবহৃত এবং গলিত। এই কথা রাজীব বললেও সংবাদ নয় যদি না কথাটির পটভূমিকায় নতুন কিছু ঘটনা থাকে। কিন্তু রাজীব যাই বলেন তাই সংবাদ এই ধারণা টিভির সংবাদ বিভাগের কর্মকারকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই তাই টিভিতে রাজীব দর্শন করাতেই হবে এটাই একটা নিয়ম। বলা বাহুল্য এই নিয়মের প্রতিবাদ কারুর করার সাধ্য নেই। রাজীব নাকি একবার নিজেও, বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরেই বলেছিলেন তাঁর প্রতি টিভি ক্যামেরার অতিরিক্ত মনোযোগ তাঁর পছন্দ নয়, বাস্ সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটিই বারংবার প্রচার করা হল। তা হবেই, কথাটা নতুন ছিল তখন, তাই তার চমকও ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারে হের-ফের হল না। রাজীবকে টিভির কাঁচের উপর আরও দৃঢ়তার সঙ্গে আনা হতে লাগল। রাজীব এবং তাঁর বন্ধুরা জানেন টিভির পর্দায় প্রাইম টাইমের দাম প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক হাজার টাকা, সে-হিসেবে দিনে চার মিনিট রাজীব দর্শনের জন্য যে খরচ জনসাধারণকে বাধ্য হয়ে দিতে হয় তার পরিমাণ দিনে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। এই খরচটা এইভাবে ধরতে হয়—ভারতে প্রায় এক কোটি টিভির সামনে প্রায় আট কোটি লোকের বিমুগ্ধচিত্তে বসে

থাকার কথা, এটি দূরদর্শনের ডাইরেক্টর ভাস্কর ঘোষ একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন কয়েক মাস আগে। তবে তিনি বিমুগ্ধচিত্ত কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু টিভির সামনে বসতে হলে বিমুগ্ধচিত্ততা ছাড়া আর কোনও উপায়েই যে বসা সম্ভব নয়। তা এই আট কোটি লোকের মধ্যে সর্বদাই কোটি তিনেক লোককে বাদ দেওয়া যেতে পারে, যাঁরা সব সময়ে টিভির সামনে বসতে পারেন না। অর্থাৎ গড়ে পাঁচ কোটি লোক টিভি চলাকালীন টিভির সামনে বসেন এবং বিমুগ্ধ হন। এই পাঁচ কোটি লোকের চার মিনিটের দাম কত? প্রতিটি মানুষের আয় ঘণ্টায় এক টাকা ধরলেও চার মিনিটে আয় প্রায় সাত পয়সা, এবং পাঁচ কোটি লোকের আয় মোটামুটি সাড়ে তিন লাখ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজীব-দর্শনের জন্য টিভি দর্শকদের খরচ হচ্ছে দৈনিক সাড়ে তিন লাখ টাকা। এই খরচ থেকে টিভি কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারতেন। এর সঙ্গে অবশ্য অন্য খরচও আছে—প্রতিদিন এক কোটি টিভির চার মিনিট বিদ্যুৎ খরচের কথাও ধরতে হয়। তাহলেও দেখা যায় একটি টিভি যদি ক্রমাগত চালানো হয় তাহলে ২৭ হাজার ৭৭৭ দিন ধরে চালানো যায়। প্রতি দিন এক টাকা ধরলেও ২৭ হাজার ৭৭৭ টাকা খরচ হয় রাজীবকে দেখার জন্য বিদ্যুৎ বাবদ। অবশ্য ভারতবর্ষের সকলের কথা বলা যায় না, সমস্ত লোকই যে রাজীবকে টিভিতে দেখতে অপছন্দ করবেন তাও ঠিক নয়। রাজীবকে নিশ্চয়ই বহু মানুষ রোজই দেখতে চান, তা এঁদের সংখ্যা লাখ দু-চার হতেও পারে, কোনও সৎ-সমীক্ষায় তা প্রকাশ পেতেও পারে।

কিংবা, এও হতে পারে যে রাজীবকে সকলেই দেখতে চান (আমাদের মতো এই দুচারজনকে বাদ দিয়েই অবশ্য কথাটা বলছি), কিন্তু তা যদি হয় তাহলেও টিভি কর্তৃপক্ষের উচিত হবে কি তাঁকে রোজই হাজির করা টিভির মাধ্যমে? ওই একই হিসেবে তাহলে ভি পি সিংকেও তো হাজির করতে হয়, কেননা, তাঁকে দেখবার লোকও যথেষ্ট। অত কথা কি, মুনমুন সেন, শাবানা আজমি, কিংবা ফিল্ম জগতের রূপ-সমৃদ্ধ কিছু তারকাকেও রোজ দেখালে কারুর আপত্তি হবে বলে মনে হবে না। অথবা, কোথাও কোনও সুন্দরী যুবতী 'সতী' দাহতে স্বেচ্ছায় অগ্নিবরণ করেছেন এমন দৃশ্যও ভারতের ভোটারের শতকরা আশী ভাগ লোক দেখতে চাইবেন বলেই মনে হয়। কেবল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকেই দেখান কেন এই প্রশ্ন অনেক টিভি মালিকই করতে পারেন।

যাঁরা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন, এবং যাঁরা রাজীবের সঙ্গে একসঙ্গে চলতে রাজি নন এমন লোকজন আজ সারা ভারতের অর্ধেক জুড়ে রাজত্ব করছেন।

হরিয়ানা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল—দিল্লির শাসনের প্রতি তাঁরা সকলেই আস্থা হারিয়েছেন এবং হারিয়ে চলেছেন। এঁদের মধ্যেও কিছু কিছু উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন, রাজনৈতিক নেতা আছেন যাঁরা টিভির কাঁচের উপর তাঁদের মুখ দেখাতে চান, কিন্তু মুসকিল এই যে দিল্লির মসনদ তাঁদের পাত্তা দেন না। ভারতে রাজীবই একমাত্র মন্ত্রী যাঁর চিত্র প্রত্যেককে দেখাতে হবে, প্রতিদিন দেখাতে হবে। তাঁর মন্ত্রিসভার আর কেউই উল্লেখযোগ্য নন! এমন কি রাষ্ট্রপতিও নন। অবশ্য, রাষ্ট্রপতি যে সংসদের দাস এটা রাজীব প্রমাণ করতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত। এবং অনেক ভেবে চিন্তেই রাজীব নতুন রাষ্ট্রপতি পদে এমন একজনকে নিয়েছেন যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করা না হলেও তিনি খুনসুটি বাধাবেন না বলে তাঁর ধারণা।

সবার উপরে রাজীব সত্য, তাহার উপরে নাই—এই জীবন দর্শনকে মেনে নিতে হয় দূরদর্শনের সমস্ত কর্মচারিকেই। সেই ভাবেই কাজকর্ম চলে। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ আজ আর ঘুমন্ত নয়, বেশ ভালভাবেই জাগ্রত। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে ঘুম অনেকেরই ভেঙেছে। তবে মুসকিল হয়েছে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে। যে মধ্যবিত্ত একদা মোটামুটি সত্য পথ দেখতে পেতেন আজ সেই মধ্যবিত্তের চিন্তা-শক্তিকে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আজ হিসেবি বে-হিসেবি বহু সহস্র কোটি টাকার একটি সামান্য অংশ টিভির দৌলতে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, কিন্তু এই সামান্য অংশও বুদ্ধিজীবীদের এক-কালীন আয়ের কাছে অনেক টাকা। তবে সব বুদ্ধিজীবীই যে টাকা পান তা নয়, কয়েকজনে পান, আর অন্যেরা আশা করেন, হয়ত একদিন আমাদের ভাগ্যেও শিকে ছিঁড়বে, অতএব তাঁরাও টিভির অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার মেনে নেন। রাজীবকে টিভির কাঁচে দেখানই একমাত্র অদ্ভুত ব্যাপার নয়। সমগ্রের তুলনায় এ ব্যাপার অতি সামান্য।

বিরাট টাকার খেলা

আজকাল টিভি সিরিয়াল হচ্ছে বিরাট অঙ্কের টাকার খেলা। একজন নামকরা লেখকের একটি মাত্র বই থেকে ১৩ অধ্যায়ের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের জন্য কেবল অনুমতিপত্রে সই করেই তিনি পেতে পারেন উনচল্লিশ হাজার টাকা। টিভির কাঁচে

যেমন সাদা-কালো ছবি দেখানো হয়, শোনা যায় এই খেলায় সাদা এবং কালো টাকাদেরও প্রভূত পরিমাণে দেখা মেলে। একজন লেখক যদি সাদায় পান এক লাখ, কালোয় তিনি নাকি দু লাখ নিয়ে থাকেন। সর্বক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নয়, এবং সাধু লেখকও নিশ্চয় এই মহা-ভারতে অনেক রয়েছেন। যাই হোক, লেখা যাই হোক না কেন তাতে সমাজের প্রকৃত কোনও সমস্যা দেখান চলবে না। এমন কি, ধরা যাক কলকাতার ফুটপাথ জবর-দখলকারীদের বিরুদ্ধেও একটি কথা বলা চলবে না। কলকাতার হাসপাতালের মতো জঘন্য হাসপাতাল পৃথিবীতেও কোথাও নেই। বলা চলবে না আমাদের এই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে চোখের বা অনেক চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। এ-সব বলা হলে রাজ্য সরকার এবং তার অনুচরবর্গ প্রতিবাদ জানাবেন এই বলে যে এটি কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের নামান্তর মাত্র। পুলিসে প্রকাশ্যে ঘুষ নিয়ে থাকেন এই অপরূপ দৃশ্যটি বহু রাস্তায় ঘুরলেই দেখা যাবে, কিন্তু এ নিয়ে কোনও ছবি তোলা চলবেনা, দেখানো চলবেনা, কেননা তাহলে সেটা সমস্ত পুলিস সমাজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগাতে সাহায্য করবে! যেন পুলিসের প্রতি মানুষের দারুণ সুতৃষ্ণা রয়েছে। সত্যমেব জয়তে? কোনও রাজনৈতিক নেতা মদ টানছেন এমন বাস্তব দৃশ্যও দেখান চলবে না। যদিও আজকাল রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মদ টানেন না এমন ব্যক্তিই নাকি ঘোরতর সংখ্যালঘু!

অন্যান্য অনুষ্ঠানে মতোই ধারাবাহিক ছবিগুলি তাই একেবারে পদার্থহীন বা সংক্ষেপে বলতে গেলে অপদার্থ হতে বাধ্য। ধারাবাহিকের অধিকাংশ অনুষ্ঠানই ব্যবসায়ীদের অর্থে তৈরি, এবং প্রদর্শিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এককালীন গণতন্ত্রী নেতা প্রচণ্ড বিশ্বাসে ঘোষণা করেছিলেন, গণতন্ত্র জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণ থেকে—এই গণতন্ত্র এই দুনিয়া থেকে কিছুতেই বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু তারপর থেকে বহু রাষ্ট্র এই গণতন্ত্র কথাটি মেনে নিয়েছেন কিন্তু কাজে কর্মে বেশ কিছু রাষ্ট্রই এটিকে কবর দিয়েছেন। এখন অনেক রাষ্ট্রই এই গণতন্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য, ব্যবসায়ীদের দ্বারা এবং ব্যবসায়ীদের থেকে—এমন গণতন্ত্র পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে না! ভারতবর্ষও ঐ সব দেশের একটি বলে গর্ব অনুভব করতে পারে। এই কারণেই, ব্যবসায়ীরা সরকারকে যে ভাবে প্রভাবিত করে থাকেন তার তুলনা মেলা ভার! সব গণতন্ত্রী দেশেই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের এক বিরাট ভূমিকা থাকে। একেবারে ব্যবসায়ী প্রভাব মুক্ত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণ ব্যবসায়ীদের কথামতো সরকার চালানো হয়ে থাকে ভারত নামের আজব দেশে! এখানে নাকি ঘড়ায় ঘড়ায় সোশালিজম-এর বাক্যাবলী ভরা থাকে। কেন্দ্রীয়

সরকার যখনই বোঝেন জনপ্রিয়তার ঘাটতি হচ্ছে তখনই ঐ সোশালিজম-বাক্য ভরা ঘড়ার প্রদর্শনী করেন। গরিবী হঠাও ধ্বনি তোলা হতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী গরিবদের গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায়, কিন্তু কাজকর্ম হয় না। দরকার ও হয় না। প্রধানমন্ত্রী গরিবদের কাছে গিয়েছেন, তাঁদের দর্শন দিয়েছেন, এটাই প্রচার করা হয় টিভির কাঁচে। ঐ টুকুই দরকার যে! দারিদ্র্য হঠাতে গেলে যে ঘর থেকেই শুরু করতে হয়! প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি-ঘর, জীবন-যাপন প্রণালী, দরিদ্র জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে নানা দেশ সফর, এর অনেকটাই বাদ দিয়ে গরিবি হঠানয় কিছুটা সাহায্য করা যেতেও পারে। দরিদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে খরচ কমানোটা হয়ত প্রতীকীই হবে, তবু এটা দরকার। যেখানে আরও দশ কেজি গম উৎপাদনের জন্য কৃষকদের সাহায্য করা দরকার সেখানে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে টিভি তৈরিরও দরকার ছিল না। অর্থাৎ যে টিভি অনুষ্ঠান দেখছি বা দেখানো হচ্ছে তার প্রয়োজন ছিল না।

সংবাদ নিরপেক্ষ নয়

আমাদের দূরদর্শনের ডাইরেক্টর ভাস্কর ঘোষ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ৭২ কোটি লোককে তথ্য জানানো, শিক্ষা দেওয়া এবং আনন্দ দেওয়াই হলো টিভির উদ্দেশ্য। টিভির তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনির্ভরযোগ্য পক্ষপাতদুষ্ট এবং অপ্রয়োজনীয়। (সেদিন কলকাতা কেন্দ্র থেকে খবরে দেখান হল ক্রিকেট খেলা দেখানর জন্য টিভি কর্তৃপক্ষ কিরকম ভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন!) সংবাদ মোটেই নিরাপক্ষ নয়—সেটি আগেই বলা হয়েছে। কেবল তাই নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়! শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরও জানানো হচ্ছিল বারংবার যে তাঁর চিকিৎসা করা হচ্ছে! অথচ ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া বেলা বারোটার আগেই সংবাদে জানিয়ে দিয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরার মৃত্যু হয়েছে। বিবিসি থেকেও সঠিক সংবাদই প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি দিল্লি দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ঘটলেও ব্যাপারটি ভারতের মানুষকে জানানো হল সন্ধে বেলা! আর ইন্দিরার মৃত্যু-দিন নিয়ে যা করা হচ্ছে তা নেহাত বাড়াবাড়ি! এমনকি, ৩১ অক্টোবর সাধের ক্রিকেটের সময় ইন্দিরা সংক্রান্ত অতি তৃতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান হল, এবং যার মধ্যে ছিল পাঁচ মিনিট নীরবতা! এটাও রাজীব দেখানর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত বলে মনে হল! কিশোর কুমারের মৃত্যুর দিন জানানই হল না কলকাতা দূরদর্শনে তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

একই ঘটনা, অর্থাৎ না জানানোর ব্যাপারটা ঘটেছিল সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর দিনও। বেলা একটা নাগাদ তিনি মারা যান। রেডিওতে কিন্তু সন্ধেবেলাতেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হয়—টিভির কাছে তখনও খবর পৌঁছয়নি। তথ্য জানানোর ব্যাপারে টিভির এই উদাসীনতা, বা অকর্মণ্যতার জন্য কিন্তু সামান্য ক্ষমাও প্রার্থনা করা হয় না। কলকাতার খবর যাঁরা বাধ্য হয়ে শোনেন তাঁরা জানেন কী অসম্ভব উদাসীন এই বিভাগটি। এখানে দিনের পর দিন ভুল বলা হয়। তরুণ চক্রবর্তী বলেন উৎকর্ষতা, কেউ বলেন পরমানবিকের জায়গায় আণবিক, কেউ ভুল প্রয়োগ করেন ফলশ্রুতির। ফলশ্রুতির অর্থ যে ফল নয় অন্য কিছু, সেটা জানার মতো বিদ্যেও তাঁদের নেই। প্রায় প্রতি দিনই সংবাদ বিভাগ ছাড়াও অন্যত্র নানারকম আজগুবি বানান দেখা যায়। যেমন, **প্রেরীত**, যেমন **অর্ন্তভুক্ত** যেটা হবে অন্তর্ভুক্ত। একটা অভিধান দেখলেই এগুলি ঠিক করে নেওয়া যায়, কিন্তু অভিধান দেখার বিদ্যেও এঁদের আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া রেডার কে রাডারও বলা হয় সংবাদে। কলকাতা কেন্দ্রের দর্শকেরা অবশ্য রাজীব গান্ধী ছাড়াও অন্য আর এক মন্ত্রীর মুখ এই টিভিতে ঘনঘন দেখতে পান, তিনি হলেন তথ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা! অজিত কুমার পাঁজা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন না যা টিভিতে না দেখালেই নয়! একটি কাগজে পড়ে জানলাম তিনি কোনও একটি জায়গায় পৌঁছে যখন দেখতে পেলেন সেখানে টিভি টিম আসেনি তখন তিনি চটে গিয়েছিলেন!

সবচেয়ে খারাপ কেন্দ্র কলকাতা

কলকাতা কেন্দ্রে গতানুগতিকতার ছড়াছড়ি। তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা নিজেই বলেছেন সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কেন্দ্র হলো কলকাতা! অবশ্য এই ব্যাপারে তিনিই যে শেষ পর্যন্ত দায়ী সে খেয়ালটাও তাঁর নেই। এটি সবচেয়ে খারাপ কেন্দ্র হতেই পারে, সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু ঐ সংবাদেই অন্যত্র লেখা ছিল তিনি নাকি রোজই টিভি কেন্দ্রে বেশ কিছু লোককে সুপারিশ করে পাঠান তাঁদের প্রোগ্রাম দিতে! কলকাতা হলো পশ্চিম বাঙলার রাজধানী। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা, এবং আমাদের গর্বের ভাষা। এখানে বাঙলা অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধে ছটা থেকে। চলে ৮টা ৩৯ পর্যন্ত। তারপর থেকে আর বাঙলা অনুষ্ঠান দেখান হয় না। শুরু হয়ে যায় হিন্দি সংবাদের হুঙ্কার। পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দি যে গেলাতে হবে নইলে মন্ত্রীর চাকরি থাকবে না! এদিকে

তামিলনাড়ুতে কিন্তু হিন্দি সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে তামিলনাড়ুতে হিন্দি বিরোধী আন্দোলনে। রবিবারে সন্ধে সাড়ে সাতটার সংবাদ ছাড়া বাঙলা অনুষ্ঠান একেবারেই থাকে না। কী চমৎকার বন্দোবস্ত! এই বন্দোবস্ত আমরা যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে মনে করি, সম্পূর্ণভাবেই মেনে নিয়েছি বলেই মনে হয়। এরজন্য কোনও মহল থেকে প্রতিবাদ পর্যন্ত শোনা যায় না, অথচ রডন স্ট্রিটের সবুজ ধ্বংস করার কথা হতে না হতেই কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী বলতে শুরু করেন এ অন্যায়। সবুজ ধ্বংস কেবল একটি পার্কেই হয় না, বা হচ্ছে না। নতুন বাড়ি তুললেই সবুজ ধ্বংস করা হয়। কলকাতা এবং শহরতলীতে আজও পেল্লায় সব বাড়ি উঠছে এবং সবুজ ধ্বংস করা হচ্ছে তখন কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে থাকেন। কয়েক বছর আগে সিঁথির মোড়ের ঘন সবুজ একটা বাইশ বিঘে অঞ্চলে বাড়ি উঠে সবুজের বারোটা বাজল, কিন্তু সে সবুজের জন্য কারুর বিন্দুমাত্র অশ্রুর দেখা পাওয়া গেল না। তারও কয়েক বছর আগে ডোভার লেনের বিস্তৃত অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারি তত্ত্বাবধানেই শেষ হয়ে গেল। বুদ্ধিজীবীদের তখনও খেয়াল হয়নি। তবু বলব শেষ পর্যন্ত রডন স্কয়ার নিয়ে এবং কলকাতা নিয়ে যে ধরনের চিন্তা শুরু হয়েছে সেই আন্দোলন যথাযথ ভাবে চালালে কলকাতারই মঙ্গল হবে। রডন স্কয়ার নিয়ে আন্দোলন যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব এর মধ্যে অন্যায় নেই, যদি এই একই মাপ-কাঠিতে কলকাতার যে কোন খোলা জমিতে বাড়ি বানানো নিয়ে প্রতিবাদ হয়, আন্দোলন হয়।

রডন স্কয়ারের আন্দোলন অনেক দেরিতে শুরু হলেও এটি সঠিক আন্দোলন যে তাতে সন্দেহ নেই। রডন স্কয়ার নিয়ে এত কথা বলার কারণ হিন্দির বিরুদ্ধে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কোনও আন্দোলন নেই। সবুজের পক্ষে তবু একটা আন্দোলন হল, কিন্তু বাঙলার পক্ষে আন্দোলন কে করবেন? 'আমরা বাঙালি'রা আছেন, তাঁরা অবশ্য অন্য জাতের এবং কোনও বুদ্ধিজীবীর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ওটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বড় পরিকল্পনার একটি অংশ, তবে পশ্চিমবাঙলায় হিন্দি চলবে, বাঙলা ক্রমশ অবহেলিত হবে সেটিও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। এই অবাঞ্ছনীয় কাজই করে চলেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য দফতর প্রধানত কলকাতা দূরদর্শনের মাধ্যমে, আপত্তিটা এখানেই। কলকাতা দূরদর্শনের কর্তৃপক্ষ বাঙলা বানানের নিয়ম জানেন এমন কোনও ব্যক্তিকে দূরদর্শনে রেখেছেন বলে মনে হয় না। বাঙলা আলোচনা যা হয় তার সামগ্রিক মান অতি নিচু স্তরের।

আলোচনা প্রাণবন্ত হয় না, কেননা আগেই বলে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা চলবে না! কারুর বিরুদ্ধেই কিছু বলা চলবে না, এবং রাজীব ছাড়া কারুর সমর্থনেও নয়! আলোচনায় সাধারণত বড়বড় বুদ্ধিজীবী আসেন না। যাঁরা আসেন তাঁদের অধিকাংশ বাঙলা বলতে পারেন না। অনেকেই স শ এবং ষ-এর মধ্যকার উচ্চারণের পার্থক্য জানেন না। একবার হাওড়া থেকে কয়েকজন যুবক একটি অনুষ্ঠানে সমস্ত 'শ' কে স্ হিশেবে উচ্চারণ করলেন তাঁরা। বাঙলা সংবাদেও উদ্যোগ দু-রকম উচ্চারণ করা হয়—কোন্‌টা সঠিক সেটা জানবার জন্য কারুরই মাথাব্যথা নেই। দর্শকেরা অসহায়। আলোচনার সময় প্রায় প্রত্যেকেই প্রবল ভাবে ইংরেজি শব্দ চালু করে দেন, অনেক সময় ভুল প্রয়োগও করেন। এমন কি "শতকরা দু ভাগ" এই বাঙলাও অনেকে জানেন না তাঁরা বলেন টু পারসেণ্ট, একজন বলেছিলেন শতকরা টু পারসেণ্ট!! নিরুদ্দেশ বিভাগে সন্ধান জানানোর ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা হয়—বাঙলা সেখানে উধাও।

এদিক দিয়ে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান অনেকটাই সহজ। বাঙলার সম্মান সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানকার বিতর্কে ছাত্ররা মোটামুটি বাঙলা ভাষাই ব্যবহার করেন, যদিও দু-একটি শব্দ যেমন পানি কথাটা কানে কেমন যেন লাগে, কিন্তু সেটি অভ্যেসের ব্যাপার! যাই হোক, বিতর্কে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের বিতর্কের পর প্রধান বিচারককে বলতে শুনেছি, "আজ যে বিতর্ক হলো সে সম্পর্কে মত দেওয়ার আগে সাধারণভাবে একটা কথা বলতে চাই, তা হলো যাঁরা এখানে তাঁদের বক্তব্য বললেন তাঁদের কথার মধ্যে অন্তত ২৩টি ইংরেজি বাক্য ছিল, এগুলির প্রত্যেকটিই বাঙলায় বলা যেত।" কিন্তু আমাদের কলকাতার দূরদর্শনে যাঁরা কর্মকারক তাঁদের বাঙলা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। কলকাতা থেকে ঘন ঘন হিন্দি অনুষ্ঠানও চালিয়ে দেওয়া হয় বিনা কারণেই।

একজন বললেন, কলকাতার একটি বড় অংশ হিন্দিভাষী, তাই হিন্দিতে তাঁদের জন্যই অনুষ্ঠান করা হয়। কেন? তাঁরা কি রাত ৮টা ৩৯ মিনিট থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হিন্দি অনুষ্ঠান শুনতে পারেন না? অন্য দিকে এ কথাও বলা যায় বাঙলার রাজধানীতে যাঁরা থাকেন তাঁরা একটু কষ্ট করে বাঙলাও তো শিখে নিতে পারেন, যেমন বলা হয় হিন্দিও তো অহিন্দিভাষীরা শিখে নিতে পারেন!! যাই হোক, নীতিটা যদি মেনেই নিতে হয় যে যেহেতু এক বিরাট সংখ্যক হিন্দিভাষী এই কলকাতায় থাকেন অতএব তাঁদের জন্য হিন্দিতে অনুষ্ঠান করা দরকার, অতএব দিল্লিতে কয়েক লক্ষ বাঙালি থাকেন তাঁদের জন্য দিল্লিতে বাঙলা অনুষ্ঠান এক-

মিনিটের জন্যও হয় না কেন? গুয়াহাটি, পাটনা, বোম্বাই, মাদ্রাজেও তো অনেক বাঙালি, সেখানে দূরদর্শনে বাঙলা প্রচারের কথা হয় না কেন? আবার কলকাতায় অনেক ওড়িশাবাসী, অসমীয়াও থাকেন, তাঁদের জন্য কিছুই করা হবে না কেন? কেবল হিন্দি বলেই জোর করা হবে? হিন্দি কিন্তু রাষ্ট্রভাষাও নয়। যাঁরা সংবিধান দেখেছেন তাঁরা জানেন হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা। যাঁরা বলেন হিন্দি রাষ্ট্র-ভাষা তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন। কেবল হিন্দিই কিন্তু ভারতের সরকারি ভাষা নয়, ইংরেজিও সরকারি ভাষা। এই দুটি ভাষা পাশাপাশি চলবে একই সম্মানে যতদিন পর্যন্ত অহিন্দি রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় হিন্দি সরকারি ভাষা বলে গ্রহণ করবে ততদিন এ-রকম ব্যবস্থা চালু থাকবে। এটি নাকি জওহরলাল নেহরুর সংসদে উচ্চারিত গ্যারান্টি! এটা মান্য করা হবে বলে রাজীবও মাঝে মাঝে জানিয়ে থাকেন। কিন্তু এটি সংবিধানগত করা হয়নি, হিন্দিওয়ালাদের চাপে পড়েই।

এই হিন্দিওয়ালারা ভারতের সর্বত্র হিন্দি চালাতে চান। এতে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী সদিচ্ছেটা প্রকট হয়ে ওঠে। নাগপুরের রেল স্টেশনে কেবল হিন্দিতেই ঘোষণা করা হয় এটা আমি দেখেছি। নোটিস বোর্ডেও হিন্দি! এমনকি বহু অহিন্দি রাজ্যে মানি অর্ডার ফর্মও ইংরেজিতে পাওয়া যায় না, তবে হিন্দি ফর্ম যথেষ্ট! হিন্দিভাষী ছাড়া ভারতের সকলকে মাতৃভাষা ছাড়া দুটি ভাষা শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে, এ নিয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা চুপ! আমাদের দেশের বামপন্থী বন্ধুগণও নীতিগত ভাবে দেশের সমস্ত প্রধান ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার সম্মান দেওয়ার পক্ষে হলেও তাঁরা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন না। তাঁরা টিভির দ্বিতীয় চ্যানেলটি চান, কিন্তু তা বাঙলা প্রচারের জন্য নয়—তা যে কিসের জন্য জানা যায় না, সম্ভবত প্রথম চ্যানেলে রাজীব নবাবী করবেন, এবং দ্বিতীয় চ্যানেলে জ্যোতি বসু মসনদ দাবি করবেন। আসলে যে কোনও সরকারের হতেই টিভির ক্লীবত্ব ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই। সমস্ত সময়েই সরকার যা করেন সেটাই মঙ্গলের জন্য করেন, সরকার কোনও ভুল করেন না, অন্যায় করেন না—এটাই প্রচারিত হবে প্রথম এবং দ্বিতীয় চ্যানেলে! যেটা দরকার হলো সেটি একটি সুস্থ নীতির, এবং সেই নীতি রূপায়ণের জন্য গঠন করতে হবে একটি উপদেষ্টা গোষ্ঠীর। সেই গোষ্ঠী যে নীতি নির্ধারণ করবেন সেটাই চালু করতে হবে। সেখানে থাকবেন রাজনৈতিক ব্যক্তি, থাকবেন কৃষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক ইত্যাদি। সেখানেও গোলমাল হবে না তা নয়, তবু মিডিয়া একনায়কত্ব থেকে উদ্ধার পাবে, অন্তত এটা পরীক্ষা করেও তো দেখা যেতে পারে। অন্তত একটি

ব্যাপারে দৃঢ় হতেই হবে, সেটি হল ধর্ম-নিরপেক্ষতা। টিভির কাঁচের উপর সমস্ত বছর ধরে ধর্মের যে নাচানাচি দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। জন্মাষ্টমী থেকে শুরু করে গণেশ, দুর্গা, কার্তিক পুজো, কালী পুজো এ সমস্তই কাঁচের পর্দা থেকে সরিয়ে দিন। সরিয়ে দিন রামায়ণের মতো ছেলে বোঝানো অপরূপ কথা। রামায়ণ পড়া আর দেখার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য! তাছাড়া, এর পেছনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার (মহাত্মা গান্ধী তো রাম-রাজ্যই চেয়েছিলেন) একটা চেষ্টাও থাকতে পারে। বলা বাহুল্য সেই রাম রাজ্যের মস্তকে কে থাকবেন সেটা গিয়ে বলে দিতে হবে না!

যাই হোক, আমরা বাঙলার মানুষ। এখানে বাঙলার উপর জোর দিতেই হবে। বাঙলা আমরা যাতে একই রকম উচ্চারণ করতে পারি, এক রকম বানান লিখতে পারি, এ নিয়ে প্রতিদিন অন্তত কুড়ি মিনিটের বাঙলা অনুষ্ঠান দরকার। যে-সব আঞ্চলিক পার্থক্য আছে উচ্চারণে তা থাক, কিন্তু যে কলকাতার এবং শান্তিপুরের বাঙলাকে আমরা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি সেটাকে চালাতে হবে। অবশ্য আমার কথা মেনে কুড়ি মিনিটের বাঙলা অনুষ্ঠানই করতে হবে তার কোনও অর্থ নেই। এ ব্যাপারে যাঁরা চর্চা করে থাকেন তাঁদের ডাকতেই হবে। তিনটি নাম এখনই মনে আসছে, এঁরা হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং পবিত্র সরকার। আরও নিশ্চয় কেউ কেউ আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে অনুষ্ঠানে কি কি থাকবে তার সূচি প্রস্তুত করা যেতে পারে। আমার মনে হয় বাঙলা অক্ষর পরিচয় হতে পারে এর প্রধান কাজ। এক কোটি টিভির লাখ পনেরো হয়ত পশ্চিমবঙ্গেই আছে, তাহলে হিসেব মতো এক কোটিরও বেশি মানুষকে এই অক্ষর শেখানোর সামনে হাজির করা যেতে পারে। হয়ত যাঁরা অক্ষর জানেন তাঁদের এই অনুষ্ঠান তেমন ভাল লাগবে না, সে সময় তাঁরা টিভি বন্ধ রাখতে পারবেন নিশ্চয়ই। কিংবা অন্য চ্যানেলে যেতে পারবেন। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সহায়ক পুস্তিকা। পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ব্লক অফিস বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কম খরচে বা বিনামূল্যে এই পুস্তিকা বিতরণ করা চলতে পারে। তারপর প্রতিদিন কয়েক মিনিট চলবে অক্ষর পরিচয়। এর ফলে বেশ কয়েক লক্ষ বয়স্ক মানুষ, নারী ও শিশু এক নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারবেন। অতঃপর কথা লেখার কৌশল শেখানো যেতে পারে—এবং তারজন্যও সহায়ক পুস্তিকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাত দিন কিংবা পনেরো দিনের এই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বছরে কয়েকবার প্রচার করাও যেতে পারে প্রয়োজন বুঝে।

ঐ বাঙলা শেখার অনুষ্ঠানে উচ্চারণ নিয়ে সহজ আলোচনা করা যেতে পারে গদ্য পাঠের মাধ্যমে। কবিতাও কেমন করে আবৃত্তি করতে হয় সেটাও এই সঙ্গে শেখানো চলতে পারে, বাঙলা শব্দের বানান বিষয়েও (এখানে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং সংবাদপত্রের লেখকদের একমত হওয়া বিশেষ দরকার অবশ্যই)। এ-নিয়ে বিশদ আলোচনার জায়গা এটি নয়। তবে দ্বিতীয় চ্যানেলে এই রকম একটা ব্যাপার নিশ্চয় ভাবা যেতে পারে।

সোশালিজম

কয়েক বছর ধরে টিভি দেখছি, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মের হরির লুঠই চলছে! বাঙলাদেশ টিভিতেও এর অন্যথা হয় না, এটা অতি দুঃখের বিষয়। কৃষিকাজে, কারখানা চালাতে কিংবা শিক্ষায় ধর্ম কাজে লাগে না। ধর্ম কথা বা সৎ কথা মানুষকে উন্নত করে তারও প্রমাণ নেই। কয়েক মাস আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধে বলেছিলেন ধর্ম ধর্ম করে যত লোক খুন হয়েছেন তার অনেক কম খুন হয়েছেন মহাযুদ্ধগুলিতে! প্রতিদিন সকালে বেতারে কোটি কোটি লোক মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ বাক্যাবলী শোনেন। ভারতের তাতে কোনও উপকার হয়েছে? ভারতের একজন লোকও কি অহিংস হতে পেরেছেন এর দ্বারা? অহিংস কথাটাই যে জীবধর্মের বিরোধী, এই সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যকে মহাত্মা গান্ধী উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেই তো আর তা সম্ভব হবে না! আমি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানি না বললেই কি সেই নিয়ম দূর হয়ে যায়? পৃথিবীর ৫০০ কোটি মানুষও যদি বলেন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানি না তাহলেও তাঁরা পাঁচ তলার ছাদ থেকে লাফালে পরিত্রাণ পাবেন না। তা প্রতি-দিন মহাত্মা গান্ধীর কথা জোর করে চালিয়ে আমরা কোথায় এসেছি? এবং কোথায় চলেছি? কোনও নেতাই মহাত্মা গান্ধীর কথা মান্য করে চলতে পারেন না। তাঁদের অনেকেই তো খুন নেন! আজকালকার যুগেও নয় এমন কি মহাত্মা গান্ধীর যুগে মহাত্মা গান্ধী নিজেও তা মানতে পারেন নি! অহিংসা কথাটি জীবিত মানুষের বা জীবের ক্ষেত্রে মিথ্যা। কিন্তু তবু ধর্ম কথার মতোই মহাত্মা কথাও কেবলি উচ্চারিত, এটি কাজে লাগে না মোটেই। কোনও রাষ্ট্র একদিনের জন্যও গান্ধীর আদর্শ নিয়ে চলতে পারে না, কেননা তাঁর আদর্শ বাস্তব বহির্ভূত এবং দিবাস্বপ্নের নামান্তর।

টিভি প্রচারের মূলে

ভাস্কর ঘোষ যাই বলুন, টিভির প্রসার এদেশে হয়েছে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। ব্যবসায়ীদের "মাল" বাজারে চালাতে হবে, অতএব ঘরে ঘরে টিভি ঢোকাও। দেশলাইয়ের কারুদের যেমন কোনও চরিত্র নেই, যে তাকে যেমন ভাবে ব্যবহার করে সেটাই তার চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। দেশলাই কাঠি উনুন ধরানোর কাজেও লাগে, কারুর বাড়িতে আগুন লাগানোর কাজেও লাগে। টিভিও তাই, এ দিয়ে সৎ, অসৎ এবং সন্দেহজনক পাঁচ হাজার রকম কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। এ দিয়ে ঘুম ভাঙানো যায়, ঘুম পাড়ানোও যায়। টিভির প্রচারে প্রায় যে কোনও ভূষি-মালই লোভনীয় করে তোলা যায় এবং বিক্রি বাড়ানো যায়। অবশ্য ভাল মালের বিক্রিও বাড়ানো যায়। মালটা কেমন তা দেখবার ব্যবস্থা নেই। কোন্ অবস্থায় কখন কাকে কোনও একটি বিশেষ ওষুধ দেওয়া যায় সেটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বিশেষ রোগীকে পরীক্ষা করে দিতে পারেন। কিন্তু টিভিতে দেখা যায় মাথা ধরা সারানোর মুঠো মুঠো ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যেন মাথা ধরাই এক জনের এক মাত্র সমস্যা! মাথা ধরার ওষুধ খেলে পেটের আলসারের রোগীর বা হৃৎপিণ্ডে রোগগ্রস্তদের যে ক্ষতি হতে পারে সেটা কিন্তু বিজ্ঞাপনে বলা হয় না। আট কোটি লোকের মধ্যে যদি দশ হাজার লোকেরও আলসার থাকে এবং তাঁরা যদি টিভির বিজ্ঞাপন দেখে সেই ওষুধ খান তাহলে তাঁদের বাঁচাবেন কে? একটি পুরনো দুধজাত গুঁড়ো, যার সঙ্গে জল মেশালে পানীয় হিসেবে বহু রোগীদের খেতে দেওয়া হয় তাতে সামান্য কয়েকটি জিনিস থাকে, এবং যেখানে এক শিশি ঐ গুঁড়ো তৈরির খরচ দশ টাকাও নয় তার জন্য দাম নেওয়া হয় পঞ্চাশ টাকা! ওর মধ্যে থাকে যবের ছাতু, চিনি—বিশেষ করে চিনি! টিভি দর্শকদের নির্বিচারে বলা হয় এই খেলে দারুণ উপকার, ক্লান্ত শরীরকে তাজা করে! কিন্তু সমস্ত লোকের পক্ষেই তো আর চিনি স্বাস্থ্যকর হতে পারে না। রোগীদের এই পানীয় দেওয়া একেবারেই চলে না যখন সেই রোগীর থাকে ডায়াবিটিস অথবা রক্তে থাকে অতিরিক্ত মেদ। কিন্তু সরকার চালিত টিভির বিজ্ঞাপনে তা নিয়ে কোন রকম সতর্কবার্তা থাকে না। ঐ সতর্কবার্তা ব্যবসায়ীদেরই দেওয়া উচিত, কিন্তু তাঁদের বাধ্য না করলে তাঁরা তা করবেন কেন? সরকার তাঁদের বাধ্য করতে পারেন, কিন্তু তা করেন না, কেননা তাহলে যে বিজ্ঞাপনের ক্ষতি হতে পারে! এমন কি পার্টি ফাণ্ডের টাকার পরিমাণও কমে যেতে পারে, অতএব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ চুপ করে যান। সেই কথাই মনে আসে, ব্যবসায়ীদের জন্য,

ব্যবসায়ীদের থেকে এবং ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক! কোনও রাজনৈতিক নেতা টিভির অযথা বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এমন ঘটনা আমার জানা নেই।

দিল্লীকা লাড্ডু

টিভির সেই অনুষ্ঠানগুলিই ভাল যেগুলিতে টিভি কর্তৃপক্ষের হাত নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস। এই খেলাগুলি হয় মাঠে, বা হলে। কিন্তু দূরদর্শনের দক্ষ ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্যরা উপস্থিত থাকেন। ক্রিকেট খেলা দেখানো হয় চমৎকার। ক্যামেরাধারীদের প্রশংসা করতেই হয়। তাঁরা বিদেশে তৈরি ক্যামেরা চালাতে পারেন বেশ ভাল ভাবেই, বোধ হয় কিছু কিছু ক্যামেরা মেরামতের কাজও জানেন। কিন্তু এক একটি ক্যামেরার দাম অনেক, হয়ত এদেশে এই মুহূর্তে হাজার-হাজার ক্যামেরা রয়েছে, এবং এক একটি ক্যামেরার দাম বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হবে। এক একটি টিভি কেন্দ্র তৈরিতেও লাগে হাজার রকমের বিদেশী যন্ত্রপাতি। এ দেশের তৈরি সমস্ত টিভিও ঠিক সবটা এদেশে তৈরি নয়। ধরা যাক গত দশ বছরে আমাদের দেশে যে এক কোটি টিভি "তৈরি" হয়েছে তার প্রত্যেকটির দাম গড়ে চার হাজার টাকা। তা হলে দশ বছরে আমরা চার হাজার কোটি টাকা দিয়েছি, "তথ্য, শিক্ষা এবং আমোদ প্রমোদের জন্য"। এর মধ্যে বহু হাজার কোটি টাকাই হয়ত বিদেশে পাঠানো হয়েছে। এই দু হাজার কোটি টাকায় নিশ্চয় আসামের প্রতি বছরের বন্যা রোধ করা যেত। বিদেশী বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমত। শতকরা দশ বারো ভাগ লোকের জন্য শতকরা ৮৮ ভাগ লোকের দুর্দশা বাড়ানোর দরকার ছিল কি? বিদেশের বৈজ্ঞানিক, করিগর এঁরা আমাদের মতো অসহায়, দেশের ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত সরকারের সৌজন্যে আরও ধনী হচ্ছেন। টিভির যে ভাল দিকটা হতে পারত সে দিকটা ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দূরদর্শনের জীবন-দর্শন এমন ভাবেই তাকে সীমিত করেছে যে শৃঙ্খল-বদ্ধ কুকুরের স্বাধীনতাও তার নেই। কুকুরও মাঝে মাঝে ডেকে উঠতে পারে, কিন্তু টিভিতে সেরকম ব্যবস্থা নেই। থাকলে রাম জেঠমালানির মতো দুষ্ট লোকের একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যেত, আর তাতে রাজীবের আতঙ্কের কারণ ছিল কি? এক মাস ধরে রাম জেঠমালানি প্রতিদিন রাজীবকে কয়েকটি করে অসুবিধেজনক প্রশ্ন করেছিলেন, সে প্রশ্নগুলির মধ্যে ছিল অতি মাত্রায় দুষ্ট উদ্দেশ্য। কিন্তু সেগুলির চরিত্র সাধারণ লোকেরাই বুঝে নিতে পারতেন যদি টিভিতে প্রচার করা হতো, কিন্তু টিভিতে রাম জেঠমালানির চিঠির বিষয়টিই

উল্লেখিত হলো না। এদিকে বৃটিশ টেলিভিশনে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহী নেতার সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচার বন্ধ করার সরকারি উদ্যোগকে সমালোচনা করে টিভির পরিচালক পদত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য সরকারের আপত্তি তুলে নেওয়া হয়।

আমাদের টিভিতে সবই খারাপ এবং এর মধ্যে কিছুই ভাল নেই, সেটা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কতকগুলি অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই ভাল দেখান হয়। ভাল অনুষ্ঠান-গুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ইংরেজি ভাষার দি ওয়ার্ল্ড অফ সারভাইভাল, কিংবা ফরাসি বৈজ্ঞানিক এবং অভিযানকারী কুস্তো-র সামুদ্রিক চিত্রগুলি। এগুলি নিঃসন্দেহে চমৎকার। কিন্তু ভারতের মধ্যে এ-রকম ছবি তোলার লোক নেই কেন? কুস্তো-র মতো লোক অবশ্য পৃথিবীতেই দুর্লভ, ওঁর মতো মানুষ, আশী বছর বয়সেও বিপদ মাথায় নিয়ে যা করছেন পৃথিবীর আর কেউ তা পারেন না ঠিকই, কিংবা থর হেয়ারডাল, যিনি কনটিকি অভিযান করেছিলেন, এমন লোক আমাদের দেশে নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশে পর্বত আরোহণ কম হয়নি, সে-গুলির ভিডিও ছবি কেউ তুলে রেখেছেন কি? অন্তত টিভিতে পূর্ণ দৈর্ঘের কোনও পর্বতাভিযানের দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েনি। আসামের কাজিরাঙা, পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া অঞ্চলে জনাকয়েক লোক কয়েকমাস ঘুরলেই একটা চমৎকার গণ্ডার-জীবন নিয়ে ছবি তুলতে পারেন, কিংবা হাতির জীবন যাপন। সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরে বাঘ, কুমির—এমনকি আমাদের যে পাট চাষ হয় সে সম্পর্কেও একটা ভাল চিত্র কেউ তুললেন না। বিদেশীরা ছবি তুলবেন সে দেশে দেখাবেন তারপর দশ বছর পর তা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের (তৃতীয় শ্রেণীর?) দেশ-গুলিতে পাঠিয়ে মুনাফা লুটবেন! আর বলিহারি আমাদের টিভি কর্তৃপক্ষের! ওঁরা যা পাঠাবেন তাই আমাদের নিতে হবে? ওয়াল্ট ডিজনে-র অবাস্তব কষ্ট-কল্পিত মিকি, ডনাল্ড ইত্যাদি না হয় কোনমতে সহ্য করা যায়। যদিও এরফলে ছোটদের এক অস্বাভাবিক জগতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু হি ম্যান কিংবা স্পাইডার-ম্যান-এর মতো বিকৃত রুচির অস্বাভাবিক ছবি দেখানর মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে? একজনের হাত থেকে মাকড়সার মতো সুতো বেরয়—তা দিয়ে সে অদাধ্য-সাধন করে, এ এক উন্মাদের কল্পনামাত্র কেবল নয়, এর ফলে শিশুদের মনে এমন একটা অস্বাভাবিকত্ব আনা হয় যা কোনমতেই সুস্থ বলা যায় না। আমি নিজে কার্টুনভক্ত হয়েও এই সব ছবি দেখানয় আপত্তি জানাচ্ছি।

আমাদের এক রসিক বন্ধু বলেন, টিভি হচ্ছে দিল্লিকা লাড্ডু! যাঁর বাড়িতে

আছে তিনি পস্তাবেন, যাঁর বাড়িতে নেই পস্তাবেন তিনিও। মুসকিলটা সেখানেই। আর একবার বাড়িতে এই যন্ত্রটা বসলে তা খোলার পর কেউ বন্ধ করেন না, তাই ক্রমাগত চলতে থাকে ভিডিও ধারা! এই ধারা থেকে ছোট বাড়িতে ছোট পরিবারের ঘরের আয়তন দশ ফুট / বারো ফুট, এরই মধ্যে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর পড়াশুনা কেমন করে সম্ভব যখন বাবা মা টিভির প্রতি নিবিষ্ট? কিংবা যখন ছোটরা খেলা দেখতে ব্যস্ত, তখন মা দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমোবেনই বা কোথায়? অনেক বাড়িতে তো শোয়ার ঘরেও টিভি থাকে। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক বলেছিলেন, কলকাতায় হঠাৎ ছোটদের চোখ খারাপ হওয়া বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ ক্রমাগত খুব কাছ থেকে টিভি দর্শন! অথচ টিভি যাঁরা বিক্রি করেন এ ব্যাপারে তাঁরা কিছুমাত্র সাবধানও করে দেন না। সরকারও স্বাভাবিক কারণেই উদাসীন। ছোটদের চোখ খারাপ হলে তাঁদের কিছু এসে যায় না। সৌভাগ্যক্রমে নেতাদের বাড়ি অত ছোট হয় না। তাঁদের ছেলে মেয়েদের টিভি দেখে চোখ নষ্ট হবার ভয় অতটা নেই।

টিভির নানা দিক আছে। এই সব দিকগুলি ভাল ভাবে গতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু কে দেখবেন খতিয়ে, কে করবেন সেই কাজ? ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কে যাবেন? জনগণ? কিন্তু সে আন্দোলন কোথায়? কে করবেন সেই আন্দোলন? সে আন্দোলনের মেঘের লক্ষণ কোথাও নেই।

১. ১১. ৮৭

সুবোধ সরকারের কবিতাগুচ্ছ

আশ্চর্য সাঁতার

টাকার লোভে বাঁচার লোভে এসেছি এই দেশে
ভুল কী আমি করেছি এই প্রবাস ভালবেসে।
বুঝেও আমি বুঝিনা, কেন বুঝিনা তুমি জানো?
আমার পায়ে ঘোড়ার খুর রয়েছে আটকানো।

এখন আমি মানুষ তবু মানুষ পুরোপুরি
হতে পারিনি বলেই আজো পাগল হয়ে ঘুরি।

জ্যোৎস্না শুধু এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়
আমার মৃত পিতার মুখ আকাশে চমকায়।

আমি তোমার যোগ্য ছেলে হতে পারিনি বলে
মেয়েটি ভালোবেসেও ডুবে গিয়েছে কল্লোলে।

যোগ্য যারা, যারা বিরাট তাদের দেখে আমি
মরণ সিঁড়ি ধরে এখন পাতাল পথে নামি।

দরজা খোলো দরজা খোলো মাটির দ্বার খোলো
পাতাল পথে কাঁচের পথে যাত্রা শুরু হলো।

কখনো উদ্ভিদ ছিলাম কিনা আমি বলতে পারবো না
কখনো জলরাশি ছিলাম কিনা আমি বলতে পারবো না

কিন্তু গোলমাল একটা হয়েছিল আমার জন্মের
একটু আগে পরে, না হলে চোখ মেলে কি করে দেখলাম

শূন্য বাড়িঘর, কৃষ্ণসার হরিণ এক ভালবাসতে এসে কাছে
আমাকে শুঁকে গেল, এবং জানিয়ে গেল ভয়ের কিছু নেই

তোমার মতোই ঠিক মানুষ হয়ে আমি প্রথমে জন্মেছি
তোমার মতো ঠিক অবাক হয়ে আমি দেখেছি স্থলভূমি।

ভারতবর্ষের মাটি দুফাঁক করে তাহলে উঠলাম?
সামনে থেকে সরো গরম কান মাথা গরম কোমরের

সঙ্গে বাঁধা আছে মৃত্যু তরবারি, আমাকে ঘাঁটিয়ো না

আমার কথা হলো সাপ ও গোলাপের মিলনে রাতারাতি
মানুষ হয়ে আমি জন্মাতেই পারি তাবলে ছোটখাটো

একটা আশ্রয়, পা রাখবার মাটি চাইতে পারবো না?

*

শহর আমি তোমাকে ঘৃণা করি।
কোথাও নেই কোথাও কোন ডানা
পাগল হয়ে তোমার ভাটিখানা
আগুন জেলে ভস্ম করে মরি
শহর আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

তোমাকে ঘৃণা করি শহর ঘৃণা
ষাঁড়ের গায়ে যে মেয়ে ঘষে পিঠ
কখনো তার ফেরে না সম্বিৎ
তোমাকে ঘৃণা করি শহর ঘৃণা
আমার বোন জানিনা আছে কিনা।

তোমার কোন ক্ষতি করিনি আমি
তোমার ছোট মেয়েকে ভালোবেসে
পাগল হয়ে গিয়েছি নিঃশেষে
তোমার কোন ক্ষতি করিনি আমি
দরজা খুলে দেখছো মাতলামি।

কাকে বাঁচাও কাকে হঠাৎ মারো
রক্ত মুখে তুলে যে লোক বাঁচে
বিছানা তার ভরিয়ে দাও কাঁচে
কাকে কখন বাঁচাও কাকে মারো
মুখের থেকে মুখের গ্রাস কাড়ো।

শহর আমি তোমার তলপেটে
দেখেছি আঁকা রয়েছে দুটো কান
বন্ধ পথ কিন্তু শোনে গান
অতিমানব হতে পারিনি বলে
শহর তুমি করেছো অপমান
শহর তুমি অবাক জলযান,
এখনো অতিমানব নই বলে
ভাসাইনিতো তোমাকে কল্লোলে।

*

আকাশে শকুন বলছিতো আকাশে শকুন তুমি তাকিয়ো না
কেন তাকাবো না আমি জন্ম একই গর্ভে কেন তাকাবো না

আকাশে এখন আলো নেই ঝামড়ে ওঠে ভাঙা হারমোনিয়াম
বিয়াল্লিশ টাকা ওফ্, যার জন্য কিশোরী প্রেমিকা

দুমিনিট চোখ বুজে হঠাৎ ওপরে উঠে কালো সেমিজ খুলে
মেঘের ভেতর দ্রুত ঢুকে গেল, এই তার পা ঝুলে রয়েছে।

সেই থেকে আমি আর সুনীল আকাশ পথে তাকাতে পারি না
মধ্যগগন থেকে হাঁড়ি করে ঈশ্বরের বিষ্ঠা নেমে আসে।

কারা দৌড়ে গেল কারা হাঁড়ির ঢাকনা খুলে গন্ধ নেবে বলে ?
তোমরা মানুষ হলে হাঁড়িতে বাস্টার্ড লিখে ফেরৎ পাঠাবে।

তোমরা মানুষ হলে সুনীল আকাশ পথে আর তাকাবে না
তোমরা মানুষ হলে পা থেকে খড়ম খুলে আকাশে ছুঁড়বে।

কিন্তু আমি এই গ্রহে এবার মানুষ হতে পারিনি বলেই
হাঁটু ভাঁজ করে বসে পাইন গাছের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।

এবার মানুষ হতে পারি নি বলেই গরীব বাবাকে আমি
এখনো আকাশে দেখি রোদ লেগে খুলে যায় হারমোনিয়াম

থু শৈশব : যে মেয়েটি পয়লা আষাঢ় নষ্ট হয়ে গেল
এই ভূমি, জনপদ তার কাছে কোনদিন সুন্দর হবে না।

তিনটি লোকের জন্য পৃথিবী সুন্দর এক পিকনিক স্পট
তিনটি লোকের জন্য তিনটি লোকের জন্য বিরাট পৃথিবী

এতোটা বিরাট হয়ে সোনার বলয় আমার কি কাজে এলো ?
তোমার কি কাজে এলো সুফলা শস্যের এই সোনার বলয় ?

মাত্র তিনজন লোক আলো ফেলে ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে দেখছে
তুমি কি এদের চেনো ? বেঁটে লোকটিকে চিনি, সব শস্য তার।

ব্যবহৃত এক নর্ম রবারের, মতো তার মুখের চামড়া
এখনো ভুলি নি, তার হাতে গ্লোব, সেই গ্লোবের ওপর

মাথা রেখে যে মেয়েটি কাঁদছে আমার জন্য, আমার কেউ না
গ্লোবের কোথাও আমি সম্মান পাবো না বলে সে আজ কাঁদছে

সে আমাকে ভালোবাসে, শুধু এই তথ্যটুকু বুঝতে পেরেছি
মোমের আলোয় বসে বাকীটা পড়তে হবে, বাকীটা ল্যাটিনে।

সুনীল আকাশ পথে তাকাবো না ভাবি কিন্তু চোখ চলে যায়
আশ্চর্য ল্যাটিন ভাষা, আশ্চর্য তিনটি লোক হো হো হেসে ওঠে।

আকাশে শকুন বলছিতো তাকিয়োনা ভাঙা হারমোনিয়াম
মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা যদি বেঁচে থাকি ওই টাকায় পেচ্ছাব

টাকায় বমন করে আলোকিত সিঁড়ি ধরে স্বর্গে উঠে যাবো
স্বর্গে যাবো নাকি যাবো জাহান্নামে সেটা কোন বড় কথা নয়

ঊষার পথে ভোরের পথে কুয়াশা পথে আমি
আমাকে কেউ ভালোবাসেনি লেকের জলে নামি।

জলে সাঁতার চিৎ সাঁতার ডুব সাঁতার ডুব
অতল জলরাশির নীচে শরীর বুদ্বুদ।

আমি কি বেঁচে থাকবো ? বেঁচে থাকার মানে আছে ?
বেশী অতলে নামি না, সিদ্ধান্ত নিই পাছে।

জলের নীচে কাকে বা চিনি ? তুমি কি কলাগাছ ?
জলের নীচে জয়িতা বস্থ ভাসছে শুধু আজ।

জয়িতা বস্থ ? এ নামে কই কে আছে পৃথিবীতে ?
যে আছে থাক ভাসছে তার কালো চুলের ফিতে।

আমাকে কেউ ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি জল
তবু তো জল ভালো, দিয়েছে অবাধ চলাচল।

মরণ ওগো মরণ তুমি জয়িতা বস্থ রূপে
মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলে রাতের অভিরূপে

কিন্তু এই সকাল শ্বেত সকাল কত ভালো
জলের নীচে ও কার ছায়া আবার চমকালো !

তীরে সে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখিনি কোনদিন
অতল জলে আমি এখন একটি ডলফিন।

তীরে যে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখবো একবার
জীবন দিয়েছিলেন তিনি তুলনা নেই তার।

ওগো জীবন যাকে কুমীর করেছে দংশন
ভূতের দেশে ছোটে বাতাস হঠাৎ শনশন।

পাগল হয়ে যাই নি আমি বলি নি মৃগনাভি
চাইলে আমি পেতাম কিনা এখন তাই ভাবি।

নারীর মৃগনাভি কোথায় থাকে ? সে কোনখানে ?
জানি না আমি জানি না, শুনি পাইনগাছ জানে।

পাইন মানে বিরাট কোন পুরুষ শত চোখে
মৃত মেয়ের বুকে দু'হাত নামিয়ে রাখে শোকে।

বিরাট কোন পুরুষ হতে পারিনি পৃথিবীতে
ওজন, ভারী ওজন নারী পারিনি পিঠে নিতে।

প্রেমিক মৃগনাভি কোথায় খুঁজেছি সারারাত
খুঁজতে খুঁজতে লেকের জলে নেমেছি দশহাত।

নেমেছি আরো নামবো নীচে যেখানে নীল জল,
আলোয় ভেসে চলেছি আমি জানি না ফলাফল।

*

অর্ধেক ভূমিষ্ঠ মাথা নড়ছিল পূর্ণিমার রাতে।
আমাকে হ্যাঁচকা টানে কে যেন
বের ধরে এনে
কচু পাতা দিয়ে ঢেকে
নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

আকাশে পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মারি
কিন্তু কাকে ? আমি
বৃন্দবন্দনার বান্দা নই।
আমি আর নই সেই উজবুক
যে তোমাকে বলবো বামী,
গোলাপ বাগানে ঢুকে অট্টহাস্য করি
কিন্তু কেন ? আমি

সে বান্দা নই
যে হুজুর তোমার গাঢ় চশমার কাঁচে বিদ্যা লেগে আছে।

টেবিলে শায়িত নারী। কার নারী? ঈথারে ছড়ানো
ওই দৃষ্টি
পালকের মতো কম্পমান ওই দৃষ্টি কার প্রতি?
কোন্ পুরুষের প্রতি?
কোন্ কোন্ পুরুষের প্রতি?

যদি জ্ঞান ফিরে আসে সার্জেন আপনি
ওকে বোলবেন
প্রথম প্রেমিক এসেছিল।
প্রথম প্রেমিক মানে
সেই, সেই প্রথম প্রেমিক
যে বাঁশী বাজাতো
যে বাঁশী বাজাতে
বাজাতে বাজাতে
প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে রেড রোড ধরে
যে হারিয়ে গিয়েছিল
সেই হল প্রেমিক প্রথম।

*

ভেসে গিয়েছিলাম নদীতে
এখনো তুমি যে দিব্যি বেঁচে আছো সে তোমার
বিরাট ভাগ্য
জিয়ানো জিওল আস্ত হাঁড়ির ভেতর
আমি তোর কণ্ঠ বুঝি মাছ,
অন্ধকারে শুয়ে থাকা বঁটি
আর তোর আশ্চর্য সাঁতার
এর মাঝামাঝি আমি উদ্ধত যুবক

উন্মাদ যুবক
কৌমার্যবিহীন
এক শতচক্ষু কবি, আমি কি বলবো?
শতচক্ষু?
জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব, কোনমতে
দুটো খোলা চোখ নিয়ে
বেঁচে আছো

ওই খোলা চোখে এর থেকে বেশী বেঁচে থাকা
যায় না রাস্কেল।

কে বলে যায় না?
কৌশিক ঘোষকে তুমি চেনো! থার্ড ইয়ারের সেই লিলিপুট
যে বড় আমেরিকায় গেছে
সেই গোলা পায়রার মতো
সুরূপা মুখার্জী—ভাবতে পারি না ওকে!
সে এখন দিল্লীতে পড়ায়।
মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে সমুদ্রে এলাম, দেখা দাও আফ্রোদিতে
সমুদ্র রাতের শেষে একটি আধুলি রেখে যায়
আমার বাঁ পায়ে।

*

বলো, হেড
বলছি তো হেড
বলো হেড
না না আমি ভাগ্য মানি না।
বলো হেড
জানি জানি জানি এই হেড আজো দুঃখশাসক
বলো হেড
এই চাবি, ৬০৩ নম্বর ঘর, পেছনে উইলো বন।

ওইতো বিমান নেমে এলো ওইতো তাকাও
লেলিহান আটলান্টিক।

সমুদ্র রাতের শেষে একটি আধুলি রেখে যায়
আমার বাঁ পায়ে
এক ঝটকায় যারা পা সরিয়ে নেয়
তাদের মনের জোর থাকে
আমার ছিল না
কিন্তু ভূতের হাত মুহূর্তে পেছন থেকে
গলা চেপে ধরে
'বল শালা কি আছে অন্তরে ?'
এমন আশ্চর্য ভাষা আমি আর কখনো শুনি নি
আমাকে পরের দিন কাদাভর্তি জলাশয়ে
দেখা গিয়েছিল।
সাঁতার কাটছি
চিৎ সাঁতার কাটছি।
ডুব সাঁতার কাটছি।

সার্জেন আপনি
টেবিলে শায়িত ওই মেয়েটিকে
জ্ঞান ফিরে এলে বোলবেন
ওকে বলবেন
প্রথম প্রেমিক এসেছিল ॥

*

ঝড়ের রাতে বিরাট কালো পিচের রেড রোড
নিয়েও আমি নিই নি, আজো নিই নি প্রতিশোধ।

ঝড়ের রাতে দূরের থেকে জয়িতা বসু ডাকে
জয়িতা বসু কোথায় সে তো জলের নীচে থাকে।

জলের নীচে চলেছে ভেসে বিরাট রেড রোড
বহন করে চলেছি কেন শরীর জুড়ে ক্রোধ ?

শহর, যদি কখনো আমি মানুষ হতে পারি
নিশীথে রেড রোডের বুকে করবো পায়চারি।

চিৎ সাঁতার ডুব সাঁতার ডুব সাঁতার ডুব
এবার আমি ব্যর্থ, ডুবে গেলাম বুদ্বুদ।

জ্যোৎস্না শুধু, এদিক থেকে ওদিকে ঝলসায়
আমার কালো চুলের রাশি আকাশে থেকে যায়।

সুবোধ সরকারের কবিতা

অভী সেনগুপ্ত

স্মৃতি যদি আমাকে হেয় না করে তবে জানাই ১৯৮০র শেষাশেষি কোনও এক সন্ধ্যায় কলেজস্ট্রীট কফি-ঘরে কবিবন্ধু ভাস্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে একই টেব্‌ল-এ বসা এক যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম সুবোধ সরকার। কৃষ্ণনগর আর কবিতায় যথাক্রমে বসবাসকারী আর বিশ্বস্ত ঐ যুবকের সঙ্গে কিছুটা সময় সদালাপে কাটে। ইতিমধ্যে ঐ টেব্‌ল্‌-এই তার সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইটির একটি কপি আমার জিম্মার জন্য চ'লে আসে। তার আগে পাঠক হিসেবে আমাকে সুবোধ সরকারের কবিতা কতটা আকর্ষণ করেছে কি করেনি আজ আর তা মনে নেই। তবে সেই আলাপের কিছু পরে ঐ কবিতার বইটি পড়ার সময় আমি অনুভব করি বইটির বেশ কিছু কবিতা আমার বসার ভঙ্গিটিকে মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার দিকে ব্যস্ত রেখেছে।

কাকতালীয় কিনা জানি না, সেই পরিচয়ের কিছুকাল পর থেকেই লক্ষ্য করি, নিবিষ্ট পাঠকদের চেনা চৌহদ্দির নানা পত্রিকায় সুবোধ সরকারের কবিতা স্থিত হয়ে চলেছে। আমাদের কবিতার যে উর্বর মালভূমিটি অজস্র রকমের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, সেই ছন্দ সাম্রাজ্যের মধ্যে টিলার পর টিলায় নেমে উঠে যেন মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি, চোখে দূরবীণ আর সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ভূ-বৈজ্ঞানিকের মতনই সুবোধ বাঙলা কবিতার ছন্দ সম্পদ নেড়ে বেড়ে দেখছেন—সে সবও লক্ষ্য করেছি। এভাবেই তার কবিতাগুলি নানান ছন্দের সজ্জায় পাঠকের হাঁটাপথের জায়গায় জায়গায় সুবোধ ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে থাকেন। বিশেষত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের (তা ৫/৬/৭ প্রভৃতি যে-কোন মাত্রাই হোক-না কেন) প্রতি তার মোহ আর পটুত্ব এখনকার বাঙলা কবিতার ভালো আর মন্দের নানান যোগ-সাজশের মধ্যেও পাঠকের মনোযোগ-কে মাঝে-মধ্যেই উস্‌কে দেয়।

এই দীর্ঘ কবিতা 'আশ্চর্য সাঁতার'-এ সুবোধ পরপর কয়েকটি ছন্দসায়রে ডুব দিয়েছেন সেই চেষ্টায় যাতে কবিতাটির ফর্মকেই কবিতাটির বিশিষ্টতা হিসেবে, যেন কবিতাটির চক্ষুদানের মতন, কাজে লাগানো যায়। অথচ স্মরণযোগ্য কবিতার ইতিহাস মূলত বিষয়কেই কবিতার চোখ হিসেবে ভাবাতে শিখিয়েছে। এভাবেই মাত্রাবৃত্তে পাঁচ মাত্রা, সাত মাত্রা, অক্ষরবৃত্ত (পয়ারধর্মী) ইত্যাদি ছন্দগুলি যৎপরোনাস্তি কবিতাটির অংশ থেকে অংশে এসেছে। কখনও বা রয়েছে অন্তমিল-সর্বস্ব ছন্দের ঝোঁক। ঠিক আছে, এইসব আসাআসি মেনে নিতে গেলেও আমাদের একটি কবিতার চেষ্টার কাছে প্রত্যাশিত 'অভিনব' শব্দটিকে বনবাসে পাঠাতে হয়। সুতরাং ছন্দ ব্যবহার কবিতাটিতে কোনও নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে ব'লে আমি মনে করি না। অন্তমিলেও সুবোধ কখনও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন যেমন ডুব / বুদ্বুদ, অপমান / জলযান, আছে / পাছে প্রভৃতি। আবার এই কবিতাতেই যেসব অন্তমিল সুন্দরের সান্নিধ্য এনে দেয় সেগুলি হচ্ছে কোনদিন / ডলফিন, ভালোবাসেনি জল / অবাধ চলাচল ইত্যাদি। কিংবা স্তবক হিসেবে প্রশংসিত হবার উদাহরণ : 'জ্যোৎস্না শুধু এদিক থেকে ওদিকে চলে যায় / আমার মৃত পিতার মুখ আকাশে চমকায়।' আর 'জলের নীচে চলেছে ভেসে বিরাট রেড রোড / বহন করে চলেছি কেন শরীর জুড়ে ক্রোধ?' তবে কবি সুবোধকে 'সুনীল আকাশ' কিংবা 'হাঁড়ি করে ঈশ্বরের বিষ্ঠা' প্রভৃতি লেখার আগে পাঠক-সুবোধের অনুমতি নেবার দাবি জানাই।

শুধু ছন্দের প্রয়োগকুশলতা দেখানোই যে কবিতা নয়, কবিতা যে বিশ্লেষণের অতীত রহস্যময় কত কিছু—এই সুস্থ মতবাদ যেন সুবোধ সরকার-কে উদাহরণ হিসেবে না ঢ্যাখায়। এত কথা বলার কারণ সুবোধের কবিতার দিকে আমাদের আগ্রহের আঙুলটি নির্দেশিত হতে চাইছে, টের পাই।

ক্রোড়পত্র

আলেহো কার্পেন্তিয়ের

সান্‌তিয়াগোর রাস্তা

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্‌তিয়াগোর রাস্তা

শেল্‌ড্‌ট নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো হুয়ান, তার নিজের ঢাকটা তার বাম উরুর কাছে ঝুলছে, আর অন্যটা (সেটা সে সদ্য জিতেছে প্রমারায়) তার কাঁধে ; এমন সময় তার মনোযোগ গিয়ে পড়লো একটা জাহাজের ওপর—এক্ষুনি সেটা তীরে ভিড়েছে, আর নৌঘাটার খুঁটিগুলোর গায়ে দড়ি বাঁধবার জন্যে হুড়মুড় ক'রে এগুচ্ছে। তার টুপির কানাৎ দিয়ে ঢাকের যে-অংশটা সে ঢাকতে পারেনি তার ওপর ঝ'রে পড়ছে মিহি ফিনফিনে বৃষ্টি ; সন্ধে আর বৃষ্টি সবকিছুকেই কেমন একটু আবছা ক'রে দিয়েছে—একেই তার ইয়ার, মদ ও খাবারের ফিরিওলার দৌলতে ব্র্যাণ্ডি আর বিয়ার মারফৎ মাথাটা ঝাপশা হ'য়ে ছিলো, তবে এ যেন তার চেয়েও বেশি ঝাপশা ; লুটারীয় চার্চটার কাছে, এখন যেটাকে ব্যবহার করা হয় আস্তাবল হিশেবে একটু দূরে, পাহাড়ের ঢালে, এখনও ফিরিওলার ঠেলাগাড়িটার সবগুলো নল থেকে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ; কিন্তু এই জাহাজটার ওপর এমন একটা বিষাদ ঝুলে আছে যে মনে হচ্ছে খালের বাষ্পকুয়াশা যেন তারই ভেতর থেকে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে, কোনো কুবাতাসের মতো। পুরোনো জং-রঙের কেম্বিস কাপড় দিয়ে তার পালগুলোয় তাপ্পিমারা ; জাহাজের দড়িদড়াগুলোর স্থতো খুলে এসেছে ; তার আড়কাঠগুলোয় জ'মে আছে ছ্যাতা আর শ্যাওলা ; জাহাজের যে-দিকটা কাত হ'য়ে নেই সেদিকে ফিতের মতো পৎপৎ ক'রে ঝুলছে মরা সমুদ্রশ্যাওলা। এখানে-সেখানে লেগে আছে কড়ি আর ঝিনুক আর আরো-সব খোলা, কোনো তারার মতো,—যেন কোনো রেডফিশ কিংবা দিনারের ছাঁচ দূরের সমুদ্রের এইসব উদ্ভিজ্জের মধ্যে বসানো ; শোকগম্ভীর দেয়ালগুলোর মধ্যে যে-জল প'ড়ে-প'ড়ে ঝিমুচ্ছে তার তুষারহিম স্পর্শে এখন সব প'চে গিয়ে খয়েরি বা গাঢ়-সবুজ হ'য়ে যাচ্ছে। চিমশে সব মাঝিমাল্লাকে দেখাচ্ছে যেন খাদ্যপ্রাণ গ-র অভাবে চামড়ার আর মাড়ির রোগে ভুগছে : তোবড়ানো ফাঁপা গাল, কোটরে-বসা চোখ, আর ফোগলা মুখ। যে-ল্যাংবোটটা তাদের ঘাটে নিয়ে এসেছিলো তা থেকে দড়িদড়া বাঁধা ও নোঙর ফেলার কাজ যখন তারা শেষ করলে, তাদের মুখে কিন্তু খুশির কোনো ছাপই পড়লো না, এমনকী শুঁড়িখানার আলোগুলো যখন জ্বালানো হ'লো, তখনও না। জাহাজ আর তার লোকজন সবাই যেন একই মনস্তাপে ডুবে গিয়েছে, যেন মাঝিমাল্লারা ঝড়তুফানের মধ্যে ঈশ্বরকে ডেকেছিলো পাপকথা ব'লে ; এখন

তারা এমনভাবে ভাঁজ ক'রে দড়িদড়া গোটাচ্ছে আর এমনই অনিচ্ছুকভাবে পাল-গুলো নামিয়ে আনছে যে তাদের যেন দণ্ড দেয়া হয়েছে কোনোদিনও ডাঙায় পা দিতে পারবে না। তারপর হঠাৎ পাটাতনের একটা ঘুলঘুলি খুলে গেলো, খুলে গেলো আদ্ধেক দরজা, আর হঠাৎ যেন সূর্য আলো ক'রে দিলে অ্যান্টওয়ার্পের সন্ধে। ছোটো-ছোটো নারঙ্গগাছ,সবাই ফলে-ফলে ঝলশাচ্ছে,সব গাছ আধাপিপেয় পোঁতা, খোলের অন্ধকার থেকে ধরাধরি ক'রে তাদের আনা হ'লো আর সুগন্ধি এক বীথিকার মতো সার ক'রে তাদের দাঁড় করিয়ে দেয়া হ'লো। ঝলমলে গোলকে সাজানো এই গাছগুলো সন্ধ্যাকে পুরোপুরি বদ্‌লে দিলে, আর ফলের রস, মরিচ আর দারচিনির মেশানো গন্ধের ঝাপটা হুয়ানকে এমনি অভিভূত ক'রে দিলে যে সে তার কাঁধ থেকে ঢাকটা নামিয়ে মাটিতে পেতে তার ওপর গ্যাঁট হ'য়ে বসলো। এতক্ষণে বোঝা গেলো যে ডিউকের প্রণয়লীলা সম্বন্ধে যে-গুজব রটেছে তার বেশ ভিত্তি আছে; মশলা দ্বীপ, ভারতের রাজ্য অথবা ওরমুথ নগরী থেকে এমন-সব উপহার আনিয়ে কোনো আল্‌বাই তাঁর প্রণয়িনীর উদগ্র বাসনা ও কণামাত্র খেয়ালকে এমন-ভাবে প্রশ্রয় দিতে পারেন। তুফান বা শত্রুজাহাজের মুখোমুখি পড়ার দুঃসাহসিক কাজে বেরিয়ে-পড়ার আগে এ-সব ছোটো-ছোটো ফলভারানত নারঙ্গগাছগুলো নিশ্চয়ই কোনো গ্রীস্টান মূরের বাগানে গজিয়েছিলো—এ-সব গাছ নিয়ে আর-কেউই নিশ্চয়ই এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারতো না; তারপর এখন গাছগুলো এখানে এসেছে প্রাসাদের সারবাঁধা আয়না-বসানো দরদালানের শোভা বাড়াবার জন্যে, যেখানে থাকে এমন-এক স্ত্রীলোক, যে তার ফ্লেমিশ বরতনুতে লালিমা মাখায় পূর্ব-ভূমধ্য সাগরের সূক্ষ্মতম প্রবালচূর্ণে। কারণ সমুদ্রযাত্রা আর আবিষ্কারের গরীয়ান দিনগুলোয়, কোনো স্ত্রীলোক যখন আব্দার ধরতে শুরু ক'রে দেয়, তখন আর কিছুতেই তাকে তুষ্ট করে না সেই-সব প্রসাধনসামগ্রী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে লোকে যাদের মূল্যবান ব'লে গণ্য করেছে; দিনেমার দেশ থেকে তার চাই কোনো নতুন উদ্ভাবন, মস্কোভা থেকে চাই নতুন মলম আর দুর্লভ কুসুমসার, যদি সে পাখি পুষতে চায় তবে তাকে হ'তেই হবে ভারতীয় তোতা, অশ্লীল কথা বলতে যে শিখেছে; আর কুকুর—উঁহু, যে-কোনো পা-চাটা নেড়ি কুকুর হ'লে চলবে না, তার চাই গ্রিফনমার্কা আহ্লাদি ল্যাপডগ, কিংবা লম্বা পশমঢাকা কোনো জীব, যার লোম ছেঁটে ফেলে বিজাতীয় গুচ্ছে বাঁধা যাবে রঙিন ফিতে। কাজেই, স্বভাবতই, সৈন্যরা যখন জামোরীয় ফিরিওলার ব্র্যাণ্ডিতে চুর হ'য়ে যায়, তখন তাদের একজন-না-একজন বেমালুম সব কাণ্ডজ্ঞান ভুলে গিয়ে বকতে শুরু ক'রে

দেয় যে, ডিউক যে অ্যাদ্দিন অ্যান্টওয়ার্পে আছেন, আর শীতের আশ্রয় যে ক্রমেই এক বসন্তকুঞ্জ হ'য়ে উঠছে, তার কারণ বীণার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে-কণ্ঠস্বর গান ক'রে ওঠে তার কাছ থেকে ডিউক কিছুতেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারেন না—প্রাচীনদের কথা মতো, সেই দূর আগে, যেমন ভাবে মধুর সুরে গাইতো সাইরেনরা, এও যেন তাই। 'সাইরেন?' যে-মেয়েটি থালাবাসন ধোয় সে আঁৎকে ব'লে ওঠে; মেয়েটি জালা-জালা মাল টানে, নাপোলি থেকে সারা রাস্তা সে সেনাবাহিনীর ল্যাজ ধ'রে পেছন-পেছন এসেছে। 'সাইরেন? মানে বলতে চাচ্ছো ঐ চুচিহুটোর দুই ঠেলাগাড়ির চাইতেও বেশি টান আছে!' হুয়ান আর বাকি কথা শোনেনি, খাবার বা পানীয়র দাম না-দিয়েই সৈন্যরা যে যেদিকে পারে হুড়মুড় ক'রে কেটে পড়েছিলো; ডিউকের কোনো ভৃত্য এসে আচমকা সব শুনে যদি এই তিড়িংবিড়িং নিয়ে লাগিয়ে দেয় কারু কানে! কিন্তু এখন, হুয়ান যখন দেখলে যে নবাগত নিম্নপদস্থ সৈন্যের তত্ত্বাবধানে নারঙ্গগাছগুলো তীরে নিয়ে-আসা হচ্ছে, বাসনমাজা মেয়েটির কথা তার মনে প'ড়ে গেলো, এই নবতম প্রমাণ তার কথাটাই আরো-স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে। সৈন্যদের রসদ-অধ্যক্ষের কতগুলো ঢাকা ঠেলাগাড়িতে এই ছোটো-ছোটো গাছগুলো ভরা হচ্ছে। আচমকাই হুয়ানের পেটের মধ্যেটা কেমন যেন ফাঁকা ঠেকলো, পাকস্থলির স্টু বা বাছুরের ঠ্যাঙের মাংস খাবার জন্যে কেমন-একটা উগ্র ইচ্ছে জাগছে যেন; হুয়ান প্রমারায় বাজিতে জেতা ঢাকটা আবার তার কাঁধে তুলে নিলে। ঠিক তখনই সে দেখতে পেলে মস্ত-এক পেট-ফোলা ইঁদুর, গায়ে ফুসকুঁড়ি আর ভাঁজ, ল্যাজটায় লোম নেই, একটা দড়িকে ঝোলানো পুলের মতো আঁকড়ে ধ'রে তীরে আসতে চাচ্ছে। খালি হাতটা দিয়ে একটা ঢিল তুলে নিয়ে সে ইঁদুরটাকে তাগ ক'রে টিপ করলে। ইঁদুরটা ঘাটায় পৌঁছেই, কোনো অচেনা-শহরে-এসে-নামা কোনো আগন্তুকের মতো, চুপ-চাপ নিশ্চল দাঁড়ালো, যেন ভাবছে কোন সরাইতে গিয়ে উঠবে। যখন সে টের পেলে যে ঢিলটা তার গা ঘেঁষে গিয়ে খালের জলে ছিটকে প'ড়ে মিলিয়ে গেলো, সে ছুটে গেলো ধর্মপ্রচারকদের সেই বাড়িটার দিকে—প্রচারকদের খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছে—এখন যেটা এক পশুখাদ্যের ভাঁড়ার। এ-ব্যাপারটা নিয়ে আর-কিছু না-ভেবেই হুয়ান নামেরীয় ফিরিওলার ঠেলাগাড়িতে ফিরে গেলো। তার বাহিনীর সৈন্যরা তখন বাসনমাজা ছুঁড়িটাকে তাতাচ্ছে, মুখে-মুখে রসালো সব গান বানাচ্ছে, আর গানের মধ্যে তার গাঁয়ের মেয়েদের বর্ণনা করছে কুমারী কলঙ্কিনী, কুটনী, আর স্বামীঠকানো বউ হিশেবে। কিন্তু ঠিক তখনই নারঙ্গগাছে বোঝাই ঠেলাগাড়ি-

গুলো গেলো পাশ দিয়ে, আর সেখানে হঠাৎ এক স্তব্ধতা নেমে এলো—যে-স্তব্ধতাটা ভাঙলো বাসনমাজা ঝির তাচ্ছিল্যের ঘেঁৎ আর একটি ঘোড়ার হ্রেষা ; যেটা লুটারীয় গির্জের মূল প্রকোষ্ঠে গমগম ক'রে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, স্বয়ং বেল-জেবাবের অট্টহাসির মতো।

২

প্রথমে ভাবা হয়েছিলো আপদটা বুঝি নিছক ফোঁড়াই—ইতালি থেকে আসা লোকদের মধ্যে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যখন তার সঙ্গে গা-পোড়ানো জ্বরও এলো যে-জ্বর মোটেই এই তরাইয়ের জ্বর নয়, আর যখন তার বাহিনীর পাঁচজন সৈন্যকে রক্তবমির জন্যে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো, হুয়ান বেশ ভয় পেয়ে গেলো। আঙুল দিয়ে সে কেবলই ভয়ে ভয়ে রগগুলো হাৎড়ায়, টিপে-টিপে দ্যাখে,—রগ ফোলা থেকেই সাধারণত শুরু হয় এই ফরাসি রোগ—এই বুঝি খুঁজে পেলে কোনো বাদামের খোলা। আর যদিও শল্যচিকিৎসক দীর্ঘদিন ফ্ল্যাণ্ডার্সে যে-রোগটা, হাওয়ার আর্দ্রতার জন্যে, দেখা দেয়নি তার নামটা স্পষ্টতই মুখ ফুটে বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, নাপোলি রাজ্যে তার বিভিন্ন ভ্রমণ তাকে এই অনুমান করতে বাধ্য করলো যে সত্যিই আসলে এ হ'লো প্লেগ, এবং রোগটার দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর রূপই। শিগগিরই সে এটাও জানতে পেলে যে বামন নারঙ্গগাছগুলা পোতটার সব মাঝিমাল্লাই যে-যার নিজের-নিজের তাক-খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে যেদিন তারা লাস্ পালমাস্-এর হাওয়ায় শ্বাস নিয়েছিলো সেদিনটাকে শাপশাপান্ত করছে, কারণ রোগটা সেখানে এনেছিলো আলজিয়ার্সের কয়েদীরা—যাদের জন্যে হাঁকা হয়েছিলো চড়া মুক্তিপণ, আর রাস্তায়-ঘাটে লোকজনকে পেড়ে ফেলছিলো বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই। আর শুধু মহামারীর ভয়ই যেন যথেষ্ট নয়, শহরের যে অংশে বাহিনী ছাউনি ফেলেছিলো সে-জায়গাটা ইঁদুর-ইঁদুরে থিকথিক করছে। হুয়ানের মনে প'ড়ে গেলো সেই অলুক্ষুণে জীবটাকে সেই লোমবিহীন ল্যাজের গা-ঘিনঘিনে ইঁদুরটাকে, প্রায় কয়েক ইঞ্চির জন্যে তার ঢিলটা যার গায়ে তাগমাফিক লাগেনি উঠোনে এখন পালে-পালে যে-ইঁদুরগুলো ছুটোছুটি করছে, তাদের মধ্যে সে-ই নিশ্চয়ই ছিলো অগ্রবর্তী ঝাণ্ডাবাহক কিংবা কোনো ধর্মদ্রোহী যাজক। ইঁদুরগুলো সাঁৎ ক'রে চুপি-সাড়ে ঢুকে পড়ছে দোকানে-দোকানে, আর নদীর এই পাড়ে সব পনীর খেয়ে সাফ ক'রে দিচ্ছে। হুয়ানের বাড়িওলা লুটারীয় দেখতে এক মৎস্যবিক্রেতা ;

রোজ সকালে সে আধখাওয়া সব হেরিং, ল্যাজা উধাও স্কেট আর শুধু কাঁটা-কাঠামোটাই প'ড়ে-থাকা বান মাছ দেখে হতাশায় মাথা কোটে ; কিংবা, আরো যেটা খারাপ, লিকলিকে পাঁকাল মাছগুলোর চৌবাচ্চায় এক ঘিনঘিনে বদমায়েশ প'ড়ে ছিলো ডুবে-মরা, চিৎপাত, পেট ওপরে। কেবল কোনো কাঁকড়া বা মাসলিঝিনুকই পারে বিদঘুটে ঘায়ে-পুঁজে ভরা ইঁদুরগুলোর রাক্ষুসে লোভটাকে ঠেকাতে—ভগবান জানে সে-কোন্ মশলাদ্বীপ থেকে এসেছে এই নচ্ছাড়গুলো—যারা এমনকী বর্মের ফিতে বা চামড়ার জিনলাগামও দাঁতে কেটে এগোয়—এমনকী বাহিনীর যাজক তাকে পবিত্র ক'রে দেবার আগেই এরা কলুষিত ক'রে গিয়েছে স্বয়ং হিব্রু পুরানের ভগবানকেও। বন্যায় ডোবা চারণভূমি থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যখন সৈন্যটিকে তার চিলেকোঠার আশ্রয়ে হি-হি ক'রে কাঁপায়, সে নিজেকে আছড়ে ফ্যালে খাটিয়ায়, কাৎরে-কাৎরে বলে যে তার বুকটা যেন জ্ব'লে যাচ্ছে, গায়ের শিরাগুলো কেমন ফুলে গিয়েছে ব্যথা করছে, আর লোককে সদাপ্রভুর স্তব শেখানো বন্ধ ক'রে সৈন্যবাহিনীর ঢাক বাজাবার কাজ নেবার যোগ্য সাজা মৃত্যুই ; এইভাবেই সে মোতেৎ আর কুয়াদ্রিউমের শিল্পকে বদ্‌লে দিয়েছে জামবধা আর শুওর-খালি করার বাঁশির সুরের সঙ্গে, গাঁয়ের যুবকরা যা বাজাতো কর্পুস ক্রিস্টির উৎসবে। তবে একটা ঢাক আর দুটো কাঠি নিয়ে কেউতো ঘুরে বেড়াতে পারে সারা জগতেই, নাপোলি রাজ্য থেকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে, তূরী আর বল্গউড বাইকের সঙ্গে-সঙ্গে ঢাকে কুচকাওয়াজের সুর তুলে। আর হুয়ান যেহেতু নিজেকে কোনোদিনই জন্মযাজক বা জন্মকান্তর ব'লে ভাবেনি, সে তাই একদিন আলফালায় মায়েস্ত্রো সিকুয়েলোর ইশকুলে ভর্তি হবার সম্ভাবিত সম্মান ত্যাগ ক'রে প্রথম রং-রুট-করা সৈন্যের পেছন-পেছন চ'লে এসেছে ; রং-রুট-করা সৈন্যটি তার হাতে আট অঙ্কের তিনটি রজতখণ্ড দিয়ে কথা দিয়েছিলো যে-কোনো সৈন্যের জীবন তাকে দেবে যত চাই তত মদ, মাগি আর প্রমারা। এখন যখন সে জগৎকে স্বচক্ষে দেখেছে, সে বুঝতে পেরেছে মানুষের সব কামনাবাসনার ফাঁপা অহমিকা ; আর সে নিজেই কেন তার মহীয়সী স্বর্গগতা মায়ের সব অশ্রুপাতের মূল কারণ। তিন-তিনটে যুদ্ধের তুলকালামের মধ্যে ঢাকে হামলার সুর বাজিয়ে অথবা ঢাকের আওয়াজের তলায় গোলাগুলির আওয়াজকে এমন ভাবে তুচ্ছ ক'রে ঢেকে দিয়ে কী ফায়দাই বা তার হ'লো, যদি এখন তাকে এই চিলেকোঠাতেই মরতে হয়, ঐসব বিয়ার টেনে পাঁড়মাতাল ফ্লেমিশগুলোর বেসুরো ঢাকের ছমছম মৃদু আওয়াজ শুনতে-শুনতে, যে-চিলেকোঠার জানলার সবুজ কাচগুলো এখন রাত-

পাহারার মশালের মনখারাপ আলোয় মিটমিট করছে? হুয়ান চীৎকার ক'রে আর্তনাদ করছিলো, বুক জ'লে যাচ্ছে, শিরাগুলো ফুলে গিয়েছে—এই ভরসায় যে ঈশ্বর যদি তার ডুকরানি শুনে শেষটায় দয়া করেন তাকে, আর প্রচণ্ডভাবে রোগটা তার দিকে লেলিয়ে দেয়া থেকে যদি বিরত থাকেন। কিন্তু আচমকাই তার শরীর যেন হামলা ক'রে দখল করে নিলে এক তুমুল ঠাণ্ডার বোধ। বুটজোড়া না-খুলেই সে শুয়ে পড়লো বিছানায়, গায়ে টেনে নিলে এক কম্বল, আর কম্বলের ওপর একটা লেপ। কিন্তু মাত্র একটা লেপ আর মাত্র একটা কম্বলে কি কিছু হয়; তার সারা শরীরটায় সামান্য একটু তাপ দিতে সারা বাহিনীর সব কম্বল আর অ্যাস্টওয়ার্পের সব লেপই তার লাগতো, রাজা দায়ুদ বৃদ্ধ বয়েসে যে-তাপ ভেবেছিলেন কোনো কিশোরীর শরীর থেকে পাবেন। তাকে শীতে ওভাবে প্রচণ্ড কাঁপতে দেখে মাছওলা—তার কাৎরানি শুনে সে ওপরে উঠেছিলো—আতঙ্কে পেছিয়ে গেলো, আর ইঁদুরে-ভরা সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় ক'রে নিচে নেমে এলো, চেঁচিয়ে বলতে লাগলো শেষটায় তারও বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে রোগ, আর ঘুষ দিয়ে পুরুৎ হবার জন্যে আর সব দলিলদস্তাবেজ নিয়ে চোরাকারবার চালাবার জন্যে ক্যাথলিকরা অবশেষে সাজা পাচ্ছে। এক কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুয়ান দেখতে পেলে শল্য-চিকিৎসকের মুখ, তার কোমরবন্ধ খুলে তিনি তার কুঁচকি আর তলপেট দেখলেন, আর আচমকা এক অতীব ছন্দোময় অথচ চাপাস্বরে বেজে ওঠা ঢাকের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে এলো আলবার ডিউকের অস্বাভাবিক আবির্ভাব।

তিনি ঢুকেছিলেন একা, পরিচয়বিহীন, কালো পোশাক গায়ে, গলায় আঁটো ক'রে বাঁধা তার শক্ত গলবন্ধ, সামনে উঁচনো ধূসর দাড়ি, আর তা দেখে মনে হ'লো তাঁর বুঝি শিরশ্ছেদ হয়েছে আর ছিন্নশিরটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোনো মর্মররেকাবিতে। হুয়ান বিছানা থেকে ওঠবার জন্যে একটা প্রচণ্ড চেষ্টা করলে, কোনো সৈন্যের যেমন উচিত সজাগ সাবধান দাঁড়ানো; কিন্তু তার অতিথি লাফিয়ে পেরুলেন তার গায়ের লেপ—এপাশ থেকে ওপাশে, তারপর দূরে একটা এস্পার্তো ঘাসের এক মোড়ায় বসলেন—সেটাতে ছিলো গোটাকয় মদে ভরা মাটির ঘড়া। মাটির ঘড়াগুলো পড়লোও না, ভাঙলোও না, যদিও ঘরটায় ছড়িয়ে পড়লো কোনো সিনাগগের জলন্ত ধূপের মতো ওলন্দাজ স্মৃতিকাপড় পোড়ার গন্ধ। বাইরে থেকেএলো অনেক তূরীভেরীর বিশৃঙ্খল বেসুরের কোলাহল, কোনো স্বরসুষমা ছাড়াই সেগুলো যেন ফুঁকছে কারা, যেন তাদের স্বরগুলোও এই একই শীতে হি-হি কাঁপছে, যা এখন রোগীর দাঁতকপাটি লাগিয়ে দিচ্ছে। ভুরু এমন কোঁচকানো যে তা হয়তো লুটার-

বাদীদের জ্যান্ত পোড়াবার হুকুম দিতো, এমনি-এক ভ্রূকুটি নিয়ে আলবার ডিউক তাঁর ছু-ফেরতা কুর্তার ভেতর থেকে তিনটে দাগধরা কমলা বার ক'রে নিয়ে কোনো বাজিকরের মতো লোফালুফি খেলতে লাগলেন, রোমকদের মতো চুলছাঁটা তাঁর মাথার ওপর, এ-হাত থেকে ও-হাতে, তাকলাগানো ক্ষিপ্রতায় কমলাগুলো তিনি লোফালুফি করতে লাগলেন। এই খেলায় তাঁর এই অপ্রত্যাশিত দক্ষতা দেখে হুয়ান তাঁকে বাহবা দেবার চেষ্টা করলে, সেই সঙ্গে তাঁকে সে সম্ভাষণ করতে চাইলে এস্পানিওলের সিংহ, ইতালির হারকিউলিস আর ফ্রান্সের যম হিশেবে—কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজই বেরুলো না। হঠাৎ ছাতের টালিতে ঝমঝম ক'রে তোড়ে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। দমকা হাওয়ার ঝাপটায় রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে গিয়ে বাতিটা নিভে গেলো। আর হুয়ান দেখতে পেলে আলবার ডিউক বেরিয়ে গেলেন হাওয়ার দমকার সঙ্গে, তাঁর শরীরটা এমনই লম্বা হ'য়ে গেলো যে মখমলের ফিতের মতো তা কুণ্ডলি পাকিয়ে গেলো জানলার সরদলে, তাঁর পেছন-পেছন গেলো কমলাগুলো, এখন তাদের আছে চোঙার মতো টুপি আর ব্যাঙের ঠ্যাঙ, আর খোশার কোঁচকানো ভাঁজে-ভাঁজে তারা হেসে উঠছে। চিলেকোঠার জানলা পেরিয়ে, উঠোন থেকে রাস্তায়, এক স্ত্রীলোক এলো বীণার হাতলে চেপে, হাওয়ায় ভেসে; তার নিচুগলার জামা থেকে ঝুলে পড়েছে তার স্তনগুলো আর ঘাঘরা উঠে গেছে ওপরে, তার বীণার তারের তলায় উন্মোচিত হ'য়ে আছে তার নধর নিতম্ব। সারা বাড়িটা থরথর ক'রে কাঁপালো একটা ঝাপটা, উড়িয়ে নিয়ে গেলো এইসব ভয়াবহ মূর্তি, আর আতঙ্কে অর্ধমূর্ছিত, হুয়ান জানলার কাছে গেলো একঝলক টাটকা হাওয়ার জন্যে, আর দেখতে পেলে যে আকাশ নির্মেঘ আর প্রশান্ত। গত গ্রীষ্মের পর, এই প্রথম, নভোমণ্ডল শাদা হ'য়ে আছে ছায়াপথে।

'এল্ কামিনো দে সান্‌তিয়াগো! সান্‌তিয়াগোর রাস্তা!' কাৎরে উঠলো হুয়ান, নতজানু বসলো তার তলোয়ারের সামনে, তলোয়ারের ডগাটা কাঠের মেঝেয় ঢোকানো, আর তার হাতলটা সম্পূর্ণভাবে তৈরি ক'রে দিয়েছে ক্রুশচিহ্ন।

৩

তীর্থযাত্রী তার শুষ্ককুঞ্চিত হাতে লাঠি আঁকড়ে ধ'রে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রান্সের রাস্তায়-রাস্তায়; সে প'রে আছে এক ঢোলা কুর্তা, চামড়ার গায়ে চমৎকার সব কড়ি আর ঝিনুক শেলাই ক'রে দিয়ে পবিত্র-করা, আর ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে

শুদ্ধ ঝর্নার জলে ভরা একটা লাউয়ের খোল। তার টুপির নোয়ানো কানাতের তলায় ক্রমেই লম্বা হচ্ছে তার দাড়ি, আর তার পশমিনা আলখাল্লার খ'য়ে-যাওয়া আঁচল ঘষটে যাচ্ছে পায়ের জীর্ণ চপ্পল, যে-চপ্পল অতীব ধার্মিকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে পারীর রাস্তায়, একবারও কোনো শুঁড়িখানার চৌকাঠ পেরোয়নি, কিংবা সান্-তিয়াগোর সিধে রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়নি—একবার শুধু দূর থেকে রুনির সন্ন্যাসী-দের দিব্যধাম দেখার কথাটি বাদ দিলে। যেখানেই রাত তার নাগাল ধ'রে ফ্যালে, হুয়ান সেখানেই শোয়; আর অনেক বাড়িরই সদয় গেরস্থরা করুণার বশে তাকে ভেতরে ডাকে; কিন্তু যখনই সে আশপাশে কোনো কনভেন্টের কথা শুনতে পায়, সে একটু দ্রুত করে তার পদক্ষেপ, যাতে আন্হেলুসের প্রহরে সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে পারে—আর খুদে ফটকের মধ্যে থেকে যে-শিক্ষার্থী ভ্রাতাটি উঁকি দেয় তার কাছে আশ্রয় চায়। তীর্থযাত্রীর পরিচয়-জানানো শাঁখের খোলটায় সে চুমু খেতে দেয়, ধর্মশালার খিলানোর তলায় শুয়ে পড়ে—সেখানে শক্ত পাথরের বেঞ্চি পাতা, আর তার ক্লান্ত অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যে শুধু এইটুকুই আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য জোটায় সে, নইলে প্রথম শীতের বৃষ্টি ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে সেইন অব্দি সারা পথ ধ'রে তার পিঠ চাবকে গিয়েছে। পরের দিন সে বেরিয়ে পড়ে ঊষাকালে, অন্তত রন-সেসভ্যালের গিরিসংকট অব্দি গিয়ে পৌঁছবার জন্যে সে অধীর, কারণ তার মনে হয় একবার সে তার নিজের দেশের লোকজনের মধ্যে দিয়ে পৌঁছুতে পারলেই তার এই ভগ্ন শরীর আর অতটা ভগ্ন থাকবে না। তুর-এ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আলেমান দেশের তীর্থযাত্রীরা, যাদের সে কথা বলে ইঙ্গিতে। পোয়াতিয়েরের সাঁৎ-ইলোয়ার তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় আরো কুড়িজন তীর্থযাত্রীর—তাদের বেশ বড়ো একটা দলই একসঙ্গে লান্দ্-এর দিকে বেরিয়েছিলো, টমার্টশে আঙুর-লতার দেশের উদ্দেশে যাবার জন্যে পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলো খোঁচা-খোঁচা উদ্ভিদে ভরা গমের খেত। এখানে এখনও গ্রীষ্মের রেশ থেকে গিয়েছে, যদিও এর মধ্যেই হেমন্তের কাজকর্ম শুরু হ'য়ে গেছে। পাইনবনগুলো আরো নিবিড়, কিন্তু অনেকক্ষণ অলসভাবে রোদ শুয়ে থাকে তাদের মগডালে, আর পথে যেতে-যেতে কিছু আঙুর তুলে নিয়ে, তাদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম ক্রমেই সুগন্ধি উদ্ভিজ্জে আর ঠাণ্ডা ছায়ায় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে শুরু করে, আর তীর্থযাত্রীরা গান জুড়ে দেয়। ফরাশিরা গান ক'রে বলে সাঁৎ জাক-এর কাছে যে-মানৎ করেছিলো তার জন্যে কত আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দিয়ে এসেছে; আলেমানরা টিউটনিদের লাতিন কাঠখোট্টা সুরে আওড়ায় কিছু কথা যার মধ্যে অন্যেরা যেটুকু বুঝতে পারে তা

হ'লো 'হেরু সাংকৃটিয়াগু! গট্ সাংকৃটিয়াগু!' আর যখন আরো-সাংগীতিক ফ্লেমিশরা কোনো স্তবগান ধরে হুয়ান তাকে অলংকৃত ক'রে দেয় সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের উদ্ভাবন দিয়ে: 'খ্রীস্টের সেনাদিব্য উপাসনায়—রক্ষা করো আমাদের—দুর্ভাগ্য থেকে!'

আর এইভাবে, আশিজনেরও বেশি তীর্থযাত্রীর সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে আ.স্ত হেঁটে তারা এসে পৌঁছোয় বেয়োন-এ, যার চমৎকার হাসপাতালে তারা গায়ের উকুন মারবার সুযোগ পায়, চটিতে লাগায় নতুন ফিতে, ভ্রাতৃসুলভ কেতায় পরস্পরের উকুন মারে, ওষুধ পায়, চক্ষুপীড়ার, ধূলিধূসর পথে চলবার জন্যে অনেকের ফোলা-ফোলা রক্তরাঙা চোখেই পিচুটি। দরদালানের উঠোন ভ'রে আছে সব ধরনেরই দুর্দশায় আর হাঘরেয়; লোকে ঘ্যাশ-ঘ্যাশ চুলকোচ্ছে তাদের খোশপাঁচড়া, খুলে দেখাচ্ছে তাদের ধ্বজভঙ্গ ধ্বস্ত লিঙ্গ, আর কূপের জলে ধুয়ে নিচ্ছে গায়ের ঘা। একজন ভুগছে গণ্ডমালায়, চেটো এমনকী ফরাশিরাজের পুণ্যস্পর্শও সারাতে পারেনি; আরেকজন ব'সে আছে একটা বেঞ্চে, দু-দিকে পা ঝুলিয়ে, একটু যদি আরাম পায় তার গুপ্ত অঙ্গ, এমন বিশাল ফুলে উঠেছে যে তাদের দেখাচ্ছে দৈত্যাকার আদামাস্তর-এর অণ্ডকোষের মতো। তীর্থযাত্রী হুয়ানই শুধু কোনো চিকিৎসার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করেনি। রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে আঙুরখেত দিয়ে হেঁটে যাবার সময় যে-ঘাম জবজবে ক'রে দিয়েছিলো তার পশমের পোশাক, তা তার দেহ থেকে নিংড়ে বার ক'রে এনেছে যাবতীয় অস্বাস্থ্য-কর কৌতুক। পরে, তার ফুশফুশগুলো উৎফুল্ল উপভোগ করেছে পাইনবনের রজনমাখা সুঘ্রাণ আর মাঝে-মধ্যে সমুদ্র-থেকে-আসা সতেজ হাওয়ার ঝাপটা। অগুনতি তীর্থযাত্রীর তৃষ্ণা-নিবারণ ক'রে যে-কূপের জল পবিত্র হ'য়ে আছে যখন সেই কূপ থেকে বালতি-বালতি জল তুলে নিয়ে প্রথমবার স্নান করলে, সে এতই সতেজ আর সানন্দ বোধ করলে যে আহুর নদীর পাশে ব'সে আস্ত-একটা মদের কলস ঢকঢক ঢেলে দিলে গলায়, এই বিশ্বাসে যে অনেক সপ্তাহ বাদে যে-লোক ঠাণ্ডা লাগাবার ঝুঁকি নিয়ে তার হাত-মাথা ভিজিয়েছে, এই প্রতিষেধক সে দাবি করতে পারে, যখন সে হাসপাতালে ফিরে এলো, তার লাউয়ের খোল তখন বিশুদ্ধ ঝর্নার জলের বদলে দুর্দান্ত-কড়া লাল মদে টাবুরটুবুর ভর্তি; দাওয়ার একটা থামে ঠেশ দিয়ে দিয়ে সে জুৎ ক'রে বসলো শান্তিতে পান করবে ব'লে। আকাশে, ছায়াপথ এখনও দেখিয়ে দিচ্ছে সান্তিয়াগোর রাস্তা। কিন্তু হুয়ানের মনমেজাজ এখন মদের প্রভাবে লঘু হ'য়ে গিয়েছে; তারকাখচিত নভোমণ্ডল তার কাছে এখন

আর সে-রকম ঠেকছে না যে-রকম ঠেকেছিলো সেই রাতে যখন প্লেগ তার কাছে এনেছিলো ভয়াবহ হুঁশিয়ারি যে বহুপাতকের জন্যে তার অদৃষ্টে আছে কঠোর নারকীয় শাস্তি। জেরুসালেমের গারদে যে-শেকল মহান দূতকে বেঁধে রেখেছিলো, তাকে গিয়ে চুমু খাবে ব'লে সে ঠিক সময়মতোই মানৎ করেছিলো। কিন্তু এখন যখন সে বিশ্রাম করছে, সুস্নাত, পরিষ্কার, উকুন আর তেমন নেই, ভেতরে আছে আরো মদ, সে ভেবে দেখতে লাগলো সত্যি-সত্যি প্লেগের জন্যেই তার জ্বর হয়েছিলো কিনা, আর সেই নারকীয় দৃশ্য ছিলো কিনা নিছকই তার জ্বরের বিকার। তার পাশে শুয়ে-থাকা এক বুড়োর গোঁ-গোঁ কাৎরানি—বিষফোঁড়া বুড়োর মুখের আদ্ধেকটাই খেয়ে ফেলেছে—তাকে মনে করিয়ে দিলে যে মানৎ হ'লো মানৎ, আর তার তীর্থযাত্রীর ঢিলে আংরাখার মাথা ঢাকায় মাথা ডুবিয়ে, সে এই তথ্যটাতেই আনন্দ পেলে যে সে পুয়েত্র্তা ফ্রানসিসার মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছুবে দৈহিক স্বস্বাস্থ্যেই, যখন অন্যরা হিঁচড়ে ব'য়ে নিয়ে যাবে তাদের পাঁচড়া আর ঘা, কোনোদিনও ঐশ্বরিক অনুগ্রহ পাবে কিনা সে-বিষয়ে তারা থাকবে সংশয়-জীর্ণ। তার পুনর্সতেজ স্বাস্থ্য তাকে সানন্দে মনে করিয়ে দিলে অ্যান্টওয়ার্পের গণিকাদের নধর কান্তি, যারা বেশি সুখ পায় ছাগলের মতো লোমশ কোনো এস্পানিতেই, রতিকর্ম শুরু করার আগে মক্কেলকে তারা বসায় তাদের বিশাল ক্রোড়ে, তারপর খুলে দেয় তাদের কাঁচুলি, এমন বাহুতে যা কাগজি বাদামের শাঁসের লেইয়ের মতোই শুভ্র। হুয়ানের লাঠির গায়ের গজালে ঝোলানো লাউয়ের খোল এখন জল না-মেশানো মদে ভর্তি।

৪

ফ্রান্সের রাস্তা থেকে বুর্গোস্-এ ঢুকে তীর্থযাত্রী হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলে এক মেলার হৈ-হৈ আমোদ ফুর্তি আর ব্যস্ততায়। সোজাসুজি ক্যাথিড্রালে যাবার ইচ্ছেটা হার মেনে গেলো টাটকা গরম-গরম চিতই পিঠের বাষ্পঘ্রাণে আর সেঁকা মাংসের গন্ধে, তার সঙ্গে আরো মিশে আছে পার্সলে আর পিমেন্টো দেয়া ঘন ঝোল মেশানো পাকস্থলি ভাজার গন্ধ—যে-সব সুখাদ্য সদয়ভাবে তাকে চেখে দেখবার জন্যে দুই মস্ত মিনারের মাঝখানে তার ঝুপড়ি থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানালে এক ফোগলা বুড়ি। তারপরে গাধার পিঠে ঝোলানো ভিস্তিগুলো ভর্তি মদ এখানে শুঁড়িখানার চাইতে অনেক শস্তা—তাও খেতে হয়। তারপরে সে আটকে গেলো ভিড়ের ঘূর্ণিতে, হা ক'রে লোকে দেখছে দৈত্যকে আর দড়বাজিকরকে, এখানে

ছড়াপাঁচালির ফিরিওলা, ওখানে একজন খুলে দেখাচ্ছে বিশাল রংচঙে পট, তার বিষয় আলুথেমায় এক মেয়ের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, কী ক'রে শয়তান তাকে গর্ভবতী ক'রে দিয়েছে, কী ক'রে সে জন্ম দিয়েছে একরাশ শুওরছানার। আরো দূরে কে-একজন কথা দিচ্ছে ব্যথা না-দিয়েই সে পোকায়-খাওয়া দাঁত টেনে তুলবে—আর রুগীদের দিচ্ছে মস্ত এক লাল রুমাল যাতে রক্ত কারু চোখে না-পড়ে, আর সারাক্ষণ কাঠের ছোটো হাতুড়ি দিয়ে একটা পেতলের ঢাক পেটাচ্ছে যাতে রুগীদের আর্তনাদ চাপা প'ড়ে যায়, আরো-একটা ঝুপড়িতে একজন বিক্রি করছে বোলোনা সাবান, হাতপায়ের হাজা-সারানো মলম, জড়িবুটি আর ড্রাগনের রক্ত। আর আছে নিয়মমাফিক শোরগোল, পিঠে ভাজার চিড়বিড় আওয়াজ, টিনের ভেঁপু বাজছে বেসুরো, বেচারা-এক নুলোঠুটোর জন্যে কুর্তাটুপি-পরা কুকুর এসে ভিক্ষে চাচ্ছে—পেছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে মানুষের মতো। ধাক্কাধাক্কির চোটে ক্লান্ত হ'য়ে তীর্থযাত্রী হুয়ান এখন এসে থামলে এক বেঞ্চিতে বসা কয়েকজন অন্ধের কা:ছ, যায় এইমাত্তর একটা গানের শেষ কলিগুলোয় এসে পৌঁছেছে, আমেরিকার আশ্চর্য হার্পিকে নিয়ে এক গান [হার্পি, অর্থাৎ পৌরাণিক সেই দানবী যার দেহের এক অর্ধেক পাখির আর অন্য অর্ধেক মেয়ের], সিংহ বা কুমির দুইই যার ভয়ে আধমরা, যে থাকতো এক দুর্গন্ধভরা ডেরায় পরিত্যক্ত জঙ্গল আর বিশাল দুই পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকায় :

হার্পিকে যে কিনিয়াছিলো, ইওরোপেরই আদমি সে—
খরিদ মূল্য দেদার দিয়ে, তাকলাগানো, পেল্লায়ই—
ভাবিয়াছিলো, মলটা দ্বীপে শিখবে সহবৎ মিশে—
ফাউ জোটাবে একটু নাফা, দেখিয়ে তারই জেল্লা ও।

সেখানে লাভ হয়না কিছু, তাই সে গেলো গ্রীস দেশে,
দু-পায়ে জিন পরানো যেন, সয় না সবুর, স্বস্তিহীন,
কনস্টান্টিনোপল হ'য়ে চললো শেষে থেু ইসে সে—
আর ওখানেই বিগড়ে গেলো হার্পি বেজায়, প্রথম দিন।
কে জানতো এই রাক্ষুসীটা নয় তো মোটেই বাধ্য যে—
মুখ গুঁজে সে রইলো ব'সে, কিছুই টঁ্যা-ফো না-ক'রেই—
এই সে প্রথম ফিরিয়ে দিলে বরাদ্দ তার খাদ্য সে—
যে-সব তারা সাজায়েছিলো সামনে তারই বিস্তরই।

খায় না কিছু, ঘাড়টা তেড়া, সাত চড়ে রা কাড়েই না—
অবাধ্য সে, খুব তেরিয়া বেজায় জেদি, মরিয়া,
হাজার অনুনয়েও ফায়দা হয় না, একেবারেই না—
এমনিভাবেই হাপিশেষে পেরোয় ভবদরিয়া।

সমস্বরে : ঠিক এভাবেই খতম হ'লো আমেরিকার সে হাপি,
ধরার বুকে অধমতম ভয়দেখানোভয়ানক—
এমনতর রাক্ষুসীরা বাঁচুক মরুক, সে কার কী—
জনমকালেই না-হয় বরং সব ক-টারই মরণ হোক।

দ্বিতীয় সারিতে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা সব চটপট কেটে পড়লো যাতে কোনো ভিক্ষে দিতে না-হয়; তারা অন্ধদের নিয়ে হাসাহাসি করলো, আর অন্ধরা মক্ষিচুষ কঞ্জুষদের ঝাড়ে-বংশের ওপর তাদের রাগ ঝাড়লো; কিন্তু অন্ধদের অন্য একটা দল একটু দূরেই তাদের রাস্তা আটকালে, পুতুলনাচ দেখাচ্ছে তারা, পালার বিষয় কেমন ক'রে মুরেরা ভেড়ার ছদ্মবেশে কুয়েন্‌থায় ঢুকেছিলো। আমেরিকার হাপির কাছ থেকে পালিয়ে এসে হুয়ান দেখলে সে সোজা কোকেনের দেশে চ'লে গিয়েছে, পেরু জয় ক'রে দেশে যার খবর পৌঁছে দিয়েছে পিথারো। এবার গায়কদের গলা অবশ্য তেমন ফাটা আর বেসুরো নয়; আর তাদের একজন যখন বন্ধ্যা নারীদের জন্যে প্রার্থনা করবে ব'লে বলছে, অন্যদের দলনায়ক—মস্ত তালঢ্যাঙা এক অন্ধ, মাথায় তার কালোটুপি,—লম্বা-লম্বা নখে গিটারের তারে ঝমঝম তুলে এক রমন্যাসের শেষ চরণগুলো গাইছে :

বাড়িতে-বাড়িতে গুলবাগিচা
সোনায়-রুপোয় সব বাঁধানো—
ফুলের শোভার সাথে অপিচ
হরচীজ দামি, চোখ ধাঁধানো।
বাহারে কে কার চেয়ে কম বা
চারকোণা জুড়ে আছে দাঁড়িয়ে
সটান চারটে গাছই লম্বা
বাকি সব গাছপালা ছাড়িয়ে।

শতেক তিতির থাকে এ-গাছে,
তুর্কিমোরগে ভরা দ্বিতীয়,
তৃতীয়ের আনাচে ও কানাচে
খরগোশ ছানা পাড়ে চুটিয়ে—
খাসি মোরগের বাসা বাকিটা।
রাশি-রাশি প'ড়ে গাছতলাতে
সোনার দিনার, কোনো ফাঁকি না—
যত খুশি ভ'রে নাও ঝোলাতে।

আর এখন, বাজনা থামিয়ে, কোনো রংরুটবাজের গম্ভীর ভঙ্গি ক'রে গিটার-টাকে ঝাণ্ডার মতো শূন্যে তুলে, অন্ধ এইভাবে শেষ করলে আর তার গলার জোর এমনই মেলার চার কিনারে গিয়ে কথাগুলো পৌঁছুলো :

সুতরাং মহোদয়জনেরা,
সবে আজ হোন উৎফুল্ল,
হঠুক দুঃখ কায়মনেরও,
কেননা কপাল আজ খুললো।
শুনুন, তাহ'লে তোফা সন্দেশ—
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে—
কষ্টের থাকবে না কোনো লেশ
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে।
গরিব? কষ্ট খুব? তাতে কী?
যত হোক আমাদের হানে না—
ওদেশে নিছকই পদপাতে তো
দূরে যাবে যাবতীয় ঝামেলা।
স্বপ্নের দেশে যেতে, কী?, রাজী?
আসুন, তাহ'লে, চ'লে এ-ধারে—
একসাথে দশখানা জাহাজই
সেভিইয়ে থেকে যাবে এবারে!
সুযোগ এসেছে, মিছে কে ফিরে
থাকবে কাহিল প'ড়ে দুঃখে?

লেখান জাহাজে নাম অচিরে
হেলায় ফেরায় সব সুখ কে ?
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে !

আবারও একবার শ্রোতারা চুপি-চুপি কেটে পড়তে লাগলো আর গায়করা তাদের উদ্দেশ ক'রে ছুঁড়ে দিলে টেরচা কথা আর গালাগালি ; হুয়ান দেখলে তাকে ঠেলতে-ঠেলতে ভিড় একটা গলির মাথায় নিয়ে এসেছে, যেখানে খুব শস্তায় মাল বিক্রি করবার ভান ক'রে এক ফিরিওলা—সদ্য সে ফিরেছে পশ্চিম ইণ্ডিস থেকে—সাতিশয় অঙ্গভঙ্গি ক'রে খড়পোড়া দুই অ্যালিগেটর বিক্রি করতে চাচ্ছে —তার কথা অনুযায়ী এ-দুটো নাকি কুথ্‌কো থেকে এসেছে। তার কাঁধে ব'সে আছে এক বাঁদর, বামবাহুতে এক তোতা। সে এক মস্ত গোলাপি শাঁখে ফুঁ দিতেই, এক লাল সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলো এক কালো দাস, মিরাকল নাটকের পালায় যেমনভাবে অতর্কিতে বেরোয় লুসিফার, হাতে সে বাড়িয়ে আছে নানা আশ্চর্য সামগ্রী : মুশুরির দানার মতো মুক্তোর মালা, এমন ঝামা যা মাথাধরা সারায়, ভিকুনিয়ার পশমে তৈরি কোমরবন্ধ, চুমকি বসানো রংচঙে দুল আর পোতোসির আরোসব আসার ও চটকদার সূক্ষ্ম কারুকাজ। যখন সে হাসে, নেগ্রোটি খুলে দেখায় এমন দাঁত যা অদ্ভুতভাবে উকো দিয়ে ঘ'ষে চোখা ক'রে দেয়া, আর তার গাল দুটি ছুরির দাগে কাটাছেঁড়ায় ভরা ; তারপর একটি তম্বুরা তুলে নিয়ে সে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, অদ্ভুত, যতদূর সম্ভব বন্য আর ক্ষিপ্র, এমনভাবে কোমর নাড়িয়ে বেঁকিয়ে সে নাচছে যেন দু-টুকরো হ'য়ে গেছে সে, আর এমন-সব অবিশ্বাস্য অঙ্গভঙ্গি করছিলো যে নাড়িভুঁড়ি বেচছিলো যে ফোগলা বুড়ি শুদ্ধু তার মাংসের ঝোলের ডেকচি ফেলে তাকে দেখতে চ'লে এলো। কিন্তু ঠিক তখনই শুরু হ'লো বৃষ্টি, আর সবাই যে যেদিকে পারে ছুটে গেলো ছাঁইচের তলায়—পুতুলনাচিয়ে তার আলখাল্লার তলায় পুতুলগুলো নিয়ে, অন্ধরা তাদের লাঠি আঁকড়ে, আর যে-মেয়েটি একগাদা শুওরছানার জন্ম দিয়েছিলো তার নামে ছড়াকাটা কাগজগুলো বেজায় ভিজে গেলো। হুয়ান নিজেকে দেখতে পেলে এক সরাইয়ের বৈঠকখানায়, লোকে ব'সে-ব'সে তাশের বাজি খেলছে আর চুটিয়ে মাল খাচ্ছে। নেগ্রোটা তার রুমাল দিয়ে বাঁদরটার গা পুঁছলো, আর একটা পিপের কানায় ব'সে তোতাটি উদ্যোগ করলে এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবার। পশ্চিম ইণ্ডিসের লোকটি মদ দিতে ব'লে তীর্থযাত্রীকে যতরাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাতে

লাগলো। অন্যসকলের মতো হুয়ান যদিও পশ্চিম ইণ্ডিসের যাবতীয় রমন্যাস সম্বন্ধে ইঁশিয়ারি পেয়েছিলো, এখন কিন্তু তার মনে হ'লো যে অনেক অবিশ্বাস্য গল্পও সত্য ব'লেই জানা গেছে। সেই উৎকট আর ভয়ংকরী দানবী আমেরিকার হাপি সত্যি মারা গেছে কনস্তান্তিনোপলে,—রেগে, খেপে গিয়ে, গর্জাতে-গর্জাতে। কোকেনের দেশের সোনার দিনারে ভরা এক দিঘি সত্যি-সত্যি আবিষ্কার করেছে এক ভাগ্যবান কাপ্তেন—যার নাম লোদোরেস দে সেন্‌ৎলাম ই দে গোর্গাস। পেরুর সোনা কিংবা পোতোসির রুপোও মোটেই পশ্চিম ইণ্ডিসের উদ্ভাবন নয়। এও কোনো গল্পগাথা নয় যে গন্‌থালো পিথারোর ঘোড়ারা ক্ষুরে সোনার নাল পরেছে। রাজার নৌবাহিনীর খাতাঞ্চি এ-সব কথা ভালোই জানতো, যখন ধন-রত্নে কানায়-কানায় বোঝাই পালের জাহাজগুলো ফিরে এসেছিলো সেভিইয়ে। মদের প্রভাবে মুখ খুলে যেতেই পশ্চিম ইণ্ডিসী এখন কম-বটানো অনেক আশ্চর্য কাহিনী শোনাতে লাগলো : এমনই-অলৌকিক জলে ভরা ঝর্না আছে এক, যার-জলে একবার স্নান ক'রে নিলেই সবচেয়ে বক্র বিকৃত বিকলাঙ্গ বুড়োও জল থেকে ডুব দিয়ে ওঠবামাত্র দেখতে পাবে যে তার মাথা ভ'রে গেছে চকচকে চুলে, ভাঁজ-গুলো সব মসৃণ, উধাও, সুস্বাস্থ্য প্রত্যাবর্তিত, গায়ের জোড়গুলো আর ফোলা নয়, আর এমনই তেজ যে পুরো একটা আমাজোন বাহিনীকেও গর্ভবতী ক'রে দিতে পারে। সে বললে ফ্লরিডার অন্বরের কথা, পুয়ের্তো ভিয়েহোতে অন্য পিথাররো কোন্-সব দানবমূর্তি দেখেছিলো, আর ইণ্ডিসে পাওয়া গেছে এমন করোটি যার দাঁত-গুলো তিনআঙুল পুরু আর যার আছে একটাই কান—গর্দানের ওপর। আরো-এক কোন নগরীও আছে কোকেনের, যেখানে সবকিছুই সোনার—এমনকী নাপিত-দের বাটিগামলাও, থালাবাসনডেকচি, গাড়ির চাকার দাঁড় আর তেলের বাতি। অবাক তীর্থযাত্রী ব'লে উঠলো, 'বাসিন্দারা সবাই নিশ্চয়ই কিমিয়াবিদ—সোনা করতে পারে !' কিন্তু পশ্চিম ইণ্ডিসী শুধু আরো মদ চেয়ে বিশদ ক'রে বললে যে ওই মহা ভোজবাজি যাঁরা সম্পাদন করেন তাঁদের সব রাতজাগা কঠোর অধ্যয়নেও ইণ্ডিসের সোনা ইতি টেনে দিয়েছে। হাওয়া নিরোধ-করা পারদ, দৈব মৃতসঞ্জীবনী, চাঁদের শেকড়, শিশুগাছের নির্যাস আর পেতল—সবকিছুই মোরিয়েনো, রাইমুন্দো আর আভিসেনার অনুরক্তরা ত্যাগ করেছে, যখন তারা নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছে অতগুলো জাহাজ কেমন তাল-তাল সোনা, সোনার কুঁজো ও কলস, আর গুঁড়ো, মূল্যবান রত্নপাথর, মূর্তি আর গয়না বোঝাই ক'রে ঘাটে এসে ভিড়েছে। এস্ত্রামাদুরার কোনো লোক নাগালে পেতে পারে এমন উঁচু ঘরবোঝাই সোনা

যেখানে, সেখানে মিছেমিছি সোনাবানানো কিমিয়াবিদ হ'য়ে কোনো লাভ নেই।

পশ্চিম ইণ্ডিসী যখন তার ঘরে গেলো, তখন রাত হ'য়ে গেছে ; এত মাল টেনে সে তখন অসংলগ্ন আবোলতাবোল বকছে ; নেগ্রো, বাঁদর আর তোতাটি গেলো আস্তাবলের ওপরকার কাড়ে। তীর্থযাত্রীর মগজটাও তার চেয়ে এমন-কিছু সাফ ছিলো না, লাঠির গায়ে ভর দিয়ে, সে এদিক ওদিক টলছে, মাঝে-মাঝে লাঠি দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকছে হাওয়ায় ; এভাবে যেতে-যেতে শহরতলির এক গলিতে গিয়ে সে পৌঁছুলো, যেখানে এক বেশ্যা তাকে সকাল অব্দি নিজের বিছানায় থাকতে দিলে—তার আলখাল্লায় যে-পবিত্র কড়িঝিনুক এখনই শেলাই খুলে ঢলঢল করছে তাদের চুমু খাবার অধিকারের বদলে। সে-রাতে শহরের ওপর দিয়ে অনেক মেঘ গেলো, ছায়াপথকে ঢেকে দিয়ে।

৫

যে-ই শুনতে রাজি থাকে, তাকেই সে এবার ব'লে বেড়াতে লাগলো যে সে এমন-এক জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে যেখানে সত্যি কোনোদিনই কিন্তু সে যায়নি। মহান সান্ তিয়াগো [সেণ্ট জেমস] আর তাঁর বন্দীশালার বেড়ি-শিকল আর যে-কুঠার তাঁর শিরচ্ছেদ করেছিলো সব প'ড়ে রইলো পেছনে। যাতে সে এখনও কনভেণ্টের ধর্মশালা ব্যবহার করতে পারে, রাইরুটির সঙ্গে চাখতে পারে তাদের বাঁধাকপির সুরুয়া এবং আরো-সব এই জাতীয় সুবিধে পায়, এইজন্যে হুয়ান এখনও প'রে আছে তার তীর্থযাত্রীর আংরাখা আর ঢোলাকুর্তা, আর বহন করছে তার লাউয়ের খোল—যদিও তাতে এখন ব্র্যাণ্ডি ছাড়া আর-কিছু নেই। দূরে অনেক পেছনে প'ড়ে আছে সিউদাদ রেয়ালের মধ্য দিয়ে যে-রাস্তা গেছে ফ্রান্স থেকে সান্তিয়াগোর দিকে, সারা রাজত্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মদে ভরা চামড়ার বোতলে মুখ লাগিয়ে টানবার জন্যে যে-রাস্তা তাকে তিন-তিনদিন আটকে রেখেছিলো। পথ দিয়ে যত যাচ্ছে তত সে বাসিন্দাদের মধ্যে একটা বদল দেখতে পাচ্ছে। ল্যাণ্ডার্সে কী ঘটছে সে-সম্বন্ধে তাদের কোনো উচ্চবাচ্য নেই ; তাদের কান খাড়া হ'য়ে আছে সেভিইয়ের দিকে, কোনো অনুপস্থিত নিরুদ্দেশ ছেলের জন্যে ; কিংবা কারু এক মামা হয়তো তার কামারশালা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো কার্তাহেনায় ; কিংবা কেউ হয়তো হারিয়েছে তার সব রুপো—সব সময়মতো নথিভুক্ত না-করার দরুন। কোনো-কোনো গাঁ থেকে আবার কারু গোটা পরিবারই চ'লে গিয়েছে : পাথরকাটিয়ে

ও তার মজুররা, ঘোড়া আর দাসদাসী নিয়ে অবস্থাবিপাকে ভরা কোনো গরিব ভদ্রলোক। এখন ঢাক পেটানো হয় গ্রামের মাঝের চত্বরে, লোক রংরুট করবার জন্যে, যাতে সমুদ্র পেরিয়ে গিয়ে এরা জয় ক'রে নেয় নতুন-নতুন প্রদেশ, যাতে সেখানে বসাতে পারে উপনিবেশ, সব সরাই, শুঁড়িখানা, পান্থশালাই নতুন-নতুন যাত্রীতে ভর্তি। আর তাই, তার 'ধর্মের কড়ি' একটি দিগ্‌দর্শিকার সঙ্গে বদ্‌লে নিয়ে, হুয়ান এসে হাজির হ'লো কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওনএ। এর মধ্যেই সে বেমালুম ভুলে গিয়েছে যে সে একজন তীর্থযাত্রী ছিলো, বরং তাকে এখন দেখাচ্ছে কোনো ছত্রভঙ্গ সঙের দলের অভিনেতার মতো, যে টাকাকড়ির অভাবে প'ড়ে পোশাকের বাক্স হাতিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষটায় মাঝখানের বিরতিতে সঙের কুর্তা প'রে এসেছে, বিস্কের যোধপুরী, পিলাতের বর্ম, আর আর্কাদিওর টুপি মাথায়, ইতালীয় শৈলীতে রচিত কোনো মিলনান্ত নাট্য যেটা দর্শককে আদপেই খুশি করতে পারেনি, তারই কোনো প্রেমার্ত রাখাল যেন। ক্রমে, এখানে একটা পুরো পা-ঢাকা মোজা, ওখানে একটা হাতাছাড়া আংরাখা বাগিয়ে নিয়ে, তার তীর্থযাত্রীর আলখাল্লা একজোড়া জুতোর জন্য বদ্‌লে নিয়ে, পুরোনো জামার ফিরি-ওলার সঙ্গে দরাদরি ক'রে দাঁও মেরে, হুয়ান এমন-একটা কেতায় সেজেছে তাকে না মনে হয় কোনো তীর্থযাত্রী, না-বা কোনো ইতালীয় সৈন্য। তার অবশ্য রংরুট-করা সার্জেণ্টের আবেদনে সাড়া দেবারও আদৌ কোনো অভিপ্রায় নেই, কারণ পশ্চিম ইণ্ডিসী তাকে ভজিয়েছে যে কোর্তেস যে-ধরনের নৌসেনা নিয়ে বেরিয়েছিলো, সে-রকম কোনো বিজেতার বহরে বেরিয়ে পড়াটা মোটেই রাতা-রাতি বড়োলোক হবার সেরা উপায় নয়। এখন ইণ্ডিসে যাতে সবচেয়ে মুনাফা জোটে সেটা হ'লো দিগ্‌দর্শিকার কাঁটার মতো একটা মন থাকা, আর চাই স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি—আর এক লাফে অন্যদের আগে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা ; কোনো রাজকীয় ফরমান, স্নাতকদের বিধি আপত্তি বা যাজকদের কোলাহলে পাত্তা দেবার কোনোই দরকার নেই। ওখানে, এমনকী ইনকুইজিশনও দিব্যি ফুর্তিবাজ ও প্রাণখোলা হ'য়ে উঠেছে, যেহেতু অত-সব নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে খুব-কিছু করারই কোনো সুযোগ নেই—ওরা তো ধর্মটর্মের ব্যাপারে একে-বারেই অজ্ঞ। তাছাড়া এ তো সকলেরই জানা যে একবার যদি তারা আশীর্বাদী অর্থাৎ সান্ বেনিতো বিলি করতে শুরু ক'রে দেয়, তাহ'লে ওদের প্রায় সবাই পড়বে সেইসব যাজকদের খপ্পরে, যৌনাধিকারের পাপে যারা নিজেরাই ভরপুর, আর যেহেতু কোনো গরম দেশে প্রবৃত্তির হঠাৎ তাড়নার কাছে বিকিয়ে-যাওয়া

খুবই সম্ভব, আমেরিকার যাজকসংঘ গোড়া থেকেই স্বীকার করেছে যে তারা সব বহ্ন্যুৎসবই ব্যবহার করবে চকোলেটের পেয়ালা গরম করতে, খামকা মিছেমিছি পাপাচারের নানাবিধ সরকারি তারতম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না-ক'রেই—যে পাপগুলো হ'লো জেদ ও অবাধ্যতা, নঞর্থক কাজ, হ্রস্বীভবন, অনুতাপশূন্যতা, মিথ্যা হলফ, শপথভঙ্গ, অথবা আলোকপ্রাপ্তি। আর তাছাড়া, যে-দেশে কোনো লুটারবাদী চার্চ কিংবা সিনাগগ নেই, ইনকুইজিশন সেখানে অনায়াসেই চোখ বুজে ঢুলতে পারে। হয়তো নেগ্রোরা মাঝে-মাঝে কাঠের মূর্তির সামনে তাদের ঢাক বাজায়, যে-মূর্তিগুলো থেকে শয়তানের ফাটা পায়ের দুর্গন্ধ ছড়ায়। কিন্তু সে তাদের নিজের মামলা, যাজকরা শুধু তাদের কাঁধ ঝাঁকায়। তারা বরং আরো ভাবিত নানা ইশতেহার, পুথিপত্র, লেখা রচনার মধ্য দিয়ে ধর্মদ্রোহ আর নাস্তিকতা ছড়িয়ে-পড়ার সমস্যায়। কাজেই, পুণ্য সলিলের ঝাঁঝরির তলায় মাথা নুইয়ে, নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই ফিরে যায় তাদের চিরাচরিত মূর্তি-পূজায়; কিন্তু তাদের না-হ'লে কিছুতেই চলে না খনিতে, আর তাদের সব রেপার্তিমিয়েন্তো বা মাশুলকে দেখতে হবে—চতুর্থ দূত যেমন বলেন—শুকনো আঙুরডালের মতো, কুড়িয়ে নিয়ে যা ছুঁড়ে ফেলতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। পশ্চিম ইণ্ডিসের এস্পানিটি হুয়ানকে তার অভিজ্ঞতার বখরা দিয়ে তাকে সুপারিশ সমেত সেভিইয়ের এক দড়িনির্মাতার জিম্মায় তুলে দিলে; দড়িনির্মাতার কারখানা ভর্তি নেয়ারের খাটিয়ায়, খড়ের জাজিমে, যেখানে তারই মতো অন্য অনেকেও সে মাসে নয়া এস্পানিওলের দিকে যে-বহর পাল তুলে সান্‌লুকার থেকে একদঙ্গল জ্যান্ত অভিযাত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার, সে-সব জাহাজে উঠবার জন্যে অনুমতি-পত্রের অপেক্ষা করছে। কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওনের খাতায় হুয়ানের নাম উঠেছে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান হিশেবে—কারণ তার তো এটা ভোলা চলবে না যে একবার তার মানৎপূর্ণ হ'লেই তাকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে ফিরে যেতে হবে; তার আগে-পরে যাদের নাম তাদের একজন হ'লো জনৈক হোর্হে, তাররাহোনার বিশপের নেগ্রো গোলাম, আর এমন-এক লোক যে একটু বেশি জোর দিয়েই অস্বীকার করলে যে তার বাবা পুরোনো ধর্মমতেই ফিরে গেছেন—আর তার ঠাকুর্দাকে পোড়ানো হয়েছে ধর্মদ্রোহী হিশেবে। নথির পাতায় পরের নামগুলো সম্রাজ্ঞীর এক চর্মপোশাকনির্মাতার, জেনোয়ার এক সদাগরের—নাম জ্যাকোমো দে কাস্তেইয়োন, গির্জের গায়কদলের কয়েকজন প্রধান গায়েন, দুই হাউই-তুবড়ি নির্মাতা, তাঁর বালকভৃত্য ফ্রানসিস্‌কিও সমেত সান্তা মারিয়া দেল দারিয়েনের

অধ্যক্ষ, ভাঙা হাত-পা জোড়া দিতে পারে এমন-এক অস্থি-বিশেষজ্ঞ, যাজক, স্নাতক, নব্যদীক্ষিত খ্রীস্টান আর সেদ্ধ নাশপাতির রক্তের এক রমণী—নাম লুথিয়া। তবে গায়ের রঙের বেলায় সেদ্ধ নাশপাতির রং বা অন্য কোনো রঙের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ করা ভালো হবে না, কেননা আন্দালুথিয়ার গোলক-ধাঁধার মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় মানুষের গায়ের রঙের এমন রকমারি বৈচিত্র্য আর বাহার দেখে হুয়ান সত্যি তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলো। সেখানে যে কেবল আলকাৎরার মতো কালো বা বেগুনের মতো চামড়া সদ্যদাসত্বমুক্ত নেগ্রোরা বহরের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারবে ব'লে হা ক'রে প্রতীক্ষা করছিলো তাই-ই নয়, ছিলো সন্ধ্যার রঙের মতো কুবার পারাকুম্বে নাচিয়েরা, শুর্মারাঙানো গিনির মেয়েরা, আর থোফালার মুলাটো মেয়েরা। আর জাহাজে ওঠবার আগের শেষ ক-টা দিনে কোনো বড়ো যাজক বা কাপ্তেনের অনুগামীদের মধ্যে অনেক ইণ্ডিয়ানকেও দেখা গিয়েছিলো যারা তাদের স্বদেশে ফেরবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলো। গুয়াতেমালার গির্জের গায়কদের যে প্রধান, তারও এই বহরের সঙ্গে পাল তুলে বেরিয়ে পড়ার কথা, তার ছিলো শুধু তারই সেবা করবার জন্যে তিন-তিনজন ভৃত্য, প্রত্যেকের গায়ের রং জলপাইরঙা, সূচিকর্মকরা জালি কাপড়ে বাঁধা তাদের ভুরু আর গায়ে পুরু পশমি কম্বল, ঢোলা আংরাখার মতো মাথার ওপর পরা, রামধনুর সব ক-টা রং তার। তিনজনেই গলায় পরেছে কুশ, কিন্তু শুধু সদাপ্রভুই জানেন তাদের ঐ খাবি-খাওয়া ভাষায় সে-কোন্ পৌত্তলিকতার কথা বলাবলি করে, যে-ভাষা শুনে মনে হয় মানুষের কথা নয়, এ বুঝি কোনো বোবা-কালার হাউ-হাউ কেঁউ-কেঁউ, ছিলো এস্পানিওলার ইণ্ডিয়ান, ইউকাতানের বাসিন্দা, পরনে শাদা ট্রাউসার, আর অন্যরা—গোল মাথা। পুরু-ফোলা ঠোঁট, আর কড়া ঘন চুল যা দেখে মনে হয় বুঝি কোনো পুডিঙের বাটি বসিয়ে ছাঁটা হয়েছে, যারা এসেছে মূল ভূখণ্ড থেকে; মাঝে-মাঝে খ্রীস্টযাগে যোগ দেয়, মেদিনা সিদোনিয়ার পরিবারের এমন তিনজন মেহিকোবাসী—যারা সালামান্‌থার রাজকুমার ফিলিপ আর দোনিয়া মারিয়ার দেখা হবার সম্মানে ভোজপরবের দিন খুবই দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েছে খুদে-সব ভেঁপু। আছে আলজিয়ার্সের খোজা আর দাগানো মুখওলা মূর গোলাম। রকমারি চটকদার পশমিনা পুঁতি আর পালকের রঙে-রঙে বর্ণময় ও উজ্জ্বল এই কোলাহলমুখর উদ্ভট বিদেশীদের ভিড়ে হুয়ানের নাকের বাঁশিতে এনে দিলে কারগে রোমাঞ্চকর অভিযানের এক ঝাঁজালো গন্ধ। আর তারপর আছে লোনাজলের খাঁড়ি যার মধ্যে জারানো

হচ্ছে পোতগুলোর ভাঁড়ারের জিনিশ ; নৌকোর ফুটোয় তাপ্পি ঢোকাবার জন্যে দড়িদড়াগুলোর আলকাংরা, শ্বেতসুরার দোকানগুলো থেকে কেনা সার্দিন, দিনরাত ধ'রে চলেছে পাশার দান আর বেশ্যাবাড়িগুলোয় চলেছে সারাবান্দের ঝমঝম, বীর মন্থর নাচ চলেছে জরাতুর, যেখানে খালাশিরা হাজির করিয়েছে খয়েরি এক উদ্ভিজ্জ চিবোবার রীতি যেটা তাদের লালা ক'রে দেয় হলদে, আর তাদের দাড়িগোঁফে দিয়ে দেয় যষ্টিমধু, সির্কা আর মশলার এক জোরালো রেশ-ছড়ানো গন্ধ।

আর অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান এখন বারদরিয়ায়। ওরা ওকে মেহিকো যেতে দেবে না, কেননা পরিষদ শুধু সে-সব অঞ্চলেই ঔপনিবেশিক পাঠাতে চায়, যেগুলো ফরাশি বোম্বেটেদের নিরন্তর হানায় গরিব আর ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছে—তাছাড়া শ্রমিকদের অভাব মেটানো চাই, কমানো চাই খনিগুলোয় ইণ্ডিয়ানদের মৃত্যুর হার। এ-খবরে হুয়ান পা ঢুকেছিলো, খিস্তি করেছিলো, গালাগাল দিয়েছিলো। তারপর সে ভেবে দেখলে এ নিশ্চয়ই কোম্পোস্তেলা না-যাবার জন্যে ঈশ্বরপ্রেরিত সাজা। কিন্তু বুর্গোসের মেলার পশ্চিম ইণ্ডিগী লাগসই মুহূর্তেই পাহশালার ভাঁটখানায় এসে হাজির হয়েছিলো আর তাকে বলেছিলো যে একবার সমুদ্র পেরুলেই পরিষদের কর্তাদের নিয়ে সে তোফা হাসাহাসি করতে পারবে, যেমন সব স্বাধীন ঔপনিবেশিকই করে সেও যেতে পারবে সেখানে খুশি। তো হুয়ানের মেজাজ শরীফ হ'য়ে গেলো আবার আর সে জাহাজের পাটাতনে গিয়ে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলে যে তিনতল জাহাজের সবচেয়ে নিচের তলাটায় একটা শুওর দৌড়ের বাজি হবে, খানশামাদের শানদার ছুরির তলায় জন্তুগুলো জবাই হ'য়ে নুন মাখিয়ে রাখার আগে। অন্য কোনো আমোদ প্রমোদের অভাবে, তারা এক মরা শান্তির একঘেয়েমিকে কাটাবার চেষ্টা করলে, ভুলে যেতে চাইলে এই তথ্য যে পিপেগুলোর পানীয় জল এর মধ্যেই দূষিত হ'য়ে গেছে ; শুওর আর বাছুরগুলোকে তারা তাড়া লাগিয়ে ততক্ষণই ছোটালে যতক্ষণ-না তারা ক্লান্ত হ'য়ে ভিমি খেয়ে পড়ে। তার-পর হ'লো পিচকিরিতে সমুদ্রের জল ভ'রে এক লড়াই ; এক খ্যাপা কুকুরের ঘাড়ে বেঁধে দেয়া হ'লো এক লাঠি, যেটা তার প্রচণ্ড ঘুরুনিতে একাধিক মাথা ফাটালো ; চোখে রুমাল বেঁধে একজন গিয়ে তাড়া করলে এক মোরগকে, দুই তক্তার ফালির মাঝখানে সেটা বাঁধা, আর মাশেতের এক কোপে উড়িয়ে দিলে তার মুণ্ডুটা ; কিন্তু যখন এইসবও বেজায় বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে উঠলো আর কিনোলা কিংবা রেনটায়ের বাজিতে দশবার এ-হাত ও-হাত বদল হ'লো টাকা, জ্বর শুরু হ'য়ে

গেলো, লোকে আছাড় পড়লো গর্মি লেগে, কে-একজন আগেই ইঁদুরে আদ্ধেক খেয়ে-যাওয়া বিস্কুটে দাঁত রেখে এলো, এক মড়াকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে-দেয়া হ'লো জলে, এক মিশেমিশে কালো নেগ্রো মাগি জন্ম দিলে যমজের, কেউ বমি করলে বার-বার, অন্যরা নিজেদের চুলকোলে সারাক্ষণ, বাকিরা খালাশ ক'রে দিলে তাদের অন্ত্র ; আর যখন মনে হ'লো নীলমাছি, উকুন, নোংরা আর দুর্গন্ধ সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেছে, দেখকোটরের পাহারা এক সকালে চেঁচিয়ে জানালে যে সে হাবানার সান্‌ক্রিস্তোবাল বন্দরের অন্তরীপ দেখতে পাচ্ছে। পৌঁছনো ততদিনে উচিতই ছিলো। হুয়ান এর মধ্যেই ধনদৌলতের সন্ধানে এই অকৃতজ্ঞ যাত্রায় একেবারে কায়েমনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, যদিও ক-দিন আগে দেখা কতগুলো উড়ুক্কু মাছ তার কাছে মনে হয়েছিলো আমেরিকার হাঁপি আর কোকেনের দেশের নিকটবর্তিতার পূর্বলক্ষণ। জড়াজড়ি-করা ছাদ আর কুঠুরির সমাবেশ—সে-ই নিশ্চয়ই শহরটা-থেকে ওঠা একটা ঢ্যাঙা ঘণ্টাঘর দেখে বেজায় খুশমেজাজে সে তুলে নিলে তার ঢাকের কাঠি আর বাজাতে শুরু ক'রে দিলে সেই কুচকাওয়াজের ছন্দ যার তালে-তালে বাহিনী ঢুকেছিলো অ্যান্টওয়ার্পে—আমাদের পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের যারা শত্রু সেই জঘন্য ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আগে, যেখানে গিয়ে তারা শীতের আশ্রয় নিয়েছিলো।

৬

কিন্তু কিছু গুজব আর কেচ্ছা ছাড়া সেখানে আর-কিছুই পাওয়া গেলো না, শুধু কুৎসা কেলেঙ্কারি আর ষড়যন্ত্র, চিঠি চালাচালি, মরণান্তিক ঘৃণা আর অপরিসীম ঈর্ষা, সারা বছর কাদায় ভরা আটটা নাড়িভুঁড়িওল্টানো রাস্তা ভর্তি শুধু এইসব, যেখানে কিছু কালোকালো নির্লোম শুওর নোংরার স্তূপের মধ্যে নাক ডুবিয়ে মাটি খুঁড়ছে। যতবারই নয়া স্পেনের বহর দেশের উদ্দেশে পাল খাটায়, জাহাজের মনিবদের দেয়া হয় দায়দায়িত্ব, চিঠিপত্র, মিথ্যা ও নিন্দা, চরিত্রহনন—সব এস্পানি-ওলে নিয়ে যাবার জন্যে, নিয়ে গিয়ে সেখানে এমন কারু হাতে তুলে দিতে হবে যে অন্য কাউকে বিপাকে ফেলতে সবচেয়ে ভালোভাবে এগুলোর সদ্ব্যবহার ও উশুল করতে পারবে। মেজাজের ওপর গরমের বিষাক্ত প্রভাবের জন্যেই হোক, আর্দ্রতা পচিয়ে দেয় সবকিছু, মশা, পায়ের নখের তলায় ডিম পাড়ে চামউকুন, নামমাত্র সুবিধের জন্যে মাৎসর্য আর গৃধ্নুতা (কারণ দেশটায় বড়োসড়ো কোনো

সুবিধেই নেই) ক্ষয়রোগের জীবাণুর মতো মানুষের আত্মাকে কুরে-কুরে খায়। যে লিখতে জানে সে তার রচনাকে কোনো সুফলের জন্যে কাজে লাগায় না, যেমন রচনাশক্তিকে কাজে লাগাতেন প্রাচীনেরা কোনো রাখালিয়া নাটক কিংবা কোর্ণসক্রিস্তিপরবের জন্যে কোনো প্রমোদনাট্য রচনা ক'রে বরং পিত্তের মধ্যে লেখনী চুবিয়ে সে চিঠি লিখে রাজার কাছে নালিশ জানিয়ে, কিংবা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত অসংলগ্ন বচসা চালিয়ে। রাজ্যপাল যখন আটপাতা লম্বা চিঠিতে রাজকর্মচারীদের কলঙ্ক রটায়, হারেমে একপাল মাগি নিয়ে থাকার জন্যে তখন বিশপ রাজ্যপালের নামে লাগায়, পরিদর্শক নালিশ করে তোলেদোর কাদি-নালের সম্মতি ছাড়াই বিশপ কীভাবে ধর্মবিচারসভার সব প্রাপ্য মেরে দিয়েছে; নির্ভুল শুল্ক না-দেবার জন্যে খাতাঞ্চির নামে লাগায় মুখ্য নথিলেখক আর খাতাঞ্চি (সে আবার পুরশাসকের জেগরি দোস্ত) অসাধুতা আর ফেরেব্বাজির জন্যে অভিযোগ করে মুখ্য নথিলেখকের নামে। আর এইভাবেই তৈরি হ'য়ে যায় এমন-এক শেকল, সবসময়েই যা দুর্বলতম অথবা সর্বাপেক্ষা অপ্রত্যাশিত জোড়ে ভেঙে পড়বার জন্যে তৈরি। কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে যে-নেগ্রো ডাইনিপুরুৎ চাবুক খেয়েছিলো, তার কাছ থেকে রতিবর্ধক ভেষজ কেনবার জন্যে একজনের নামে প্রকাশ্যে দোষারোপ করা হ'লো; নগরঘোষকের নামে অভিযোগ হ'লো সে নাকি জঘন্য ও অকথ্য এক পাপ কাজ করেছে, এক মুদি ও কশাইয়ের নামে নালিশ যে সে নাকি খাশ জমির সীমা নিয়ে কারচুপি করেছে; গির্জের মুখ্যনায়ক ব্যাভিচারে লিপ্ত; মুখ্য গোলন্দাজ পাঁড় মাতাল, আর আসাবরদার বালকদের পায়ুকামী। নগরক্ষৌরকার—তার টেরা চোখ তো এমনিতেই এক অপরাধ-হাঁপরে নেহাইয়ে কলঙ্কারোপের শেকলের শেষ জোড়টা এই ঘোষণা ক'রে তৈরি করলে যে পূর্বতন রাজ্যপালের ধর্মপত্নী দোনিয়া ভিয়েলান্তে আসলে এক খানদানি বারবনিতা, নিজের গোলামগুলোর সঙ্গেই তাঁর সব ধিক্কারযোগ্য কাজকারবারমহব্বৎ। ফলে সান্ ক্রিস্তোবাল হ'য়ে উঠেছে আস্ত একটা নরক, যেখানে লোকে ধুঁকতে ধুঁকতে বহন করছে এই মাটি পৃথিবীর অন্যসবখানের চাইতেও এক দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্ব, পচা তেলের দুর্গন্ধে ভরা ইণ্ডিয়ান ভৃত্য আর আমেরিকার ভুঁইভোঁদড়ের গন্ধওলা নেগ্রো গোলামগুলোর মাঝখানে! আহ! ইণ্ডিস! ইণ্ডিস! অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ানের মেজাজকে যা একটু আমোদফুর্তি জোগালে তা মেহিকো বা এস্পানি-ওলার খালাশিরা। তারপর, দিনকয়েকের জন্যে, তার মনে প'ড়ে যায় যে সে একজন সৈন্য, আর হয়তো কশাইদের কাছ থেকে চুরি ক'রে নেয় গোমাংসের রাং,

তাদের কয়েকজনে মিলে সেটা রান্না ক'রে নেয় আনাস্তোর লেইয়ে অথবা ভেরা-ক্রুসের গুঁড়ো লঙ্কায়; কিংবা সে জেলেদের সাহায্য করে দরজা খুলে ঢোকবার সময় আর ঝুড়ি-ঝুড়ি পোরজে মাছ অথবা টাটকা জলের কাছিম নিয়ে কেটে পড়ে। এইসব মাসেই, আরো মুখরোচক তরিবৎ খাদ্যের অভাবে হুয়ান আস্তে-আস্তে টোম্যাটো, মিষ্টি আলু বা ফণিমনসার গুটির মতো নয়া খাবারের রুচি তৈরি ক'রে নিলে। তার নাকের বাঁশি সে ভরিয়ে নেয় তামাকে, আর যে-সব দিনে খাদ্যের বেশ অভাব—এই অভাব অবশ্য প্রায়ই লেগে থাকে—সে তার মানিওক রুটি চুবিয়ে নেয় আখের রসে, পরে বাটিতে মুখ চুকিয়ে সব চেটেপুটে সাফ ক'রে দেয়। আর জাহাজের মাল্লারা যখন তীরে আসে, সে দাসত্বমুক্ত নেগ্রো মেয়েদেয় সঙ্গে নাচে, যারা কাঠের বেড়া দেয় আস্তানায় ছারপোকা-থিকথিক জাজিম রাখে, জাহাজ মেরামতির ঘাটের কাছেই,—মহাপাতকের মতো কুৎসিত তারা, কিন্তু মেয়ে নইলে একে-বারেই দুর্লভ। কোনো জাহাজ চোখে পড়লে, অথবা কোনো শোভাযাত্রার সামনে হাঁটতে-হাঁটতে, কিংবা বড়োদিনের সময় মুলাটো মাগিগুলো যখন মারাকাস ঝমঝম করে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে তার ঢাক পিটিয়ে সামান্য যা অর্থ সে উপার্জন করে, সব সে রুটির কারখানার পাশে রাজ্যপালের এক দোস্তের কাবাবের দোকানেই উড়িয়ে দেয়—যেখানে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় জালা-জালা অতি অখাদ্য লাল মদ। সিউদাদ রেয়াল বা রিবাদাভিয়া বা কাথাইয়ার মদ চেয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর ক'রে কোনোই ফায়দা হয় না এখানে। যে-মাল সে ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দেয়, জিভে তার স্বাদ ঠেকে রুক্ষ, টোকো, বাজে, দ্বীপে যা-কিছু উৎপন্ন হয় তার মতোই অতীব দুর্মূল্যও। জামাকাপড় প'চে যায়, জং ধ'রে যায় অস্ত্রেশস্ত্রে, দলিলদস্তাবেজের ওপর গজিয়ে ওঠে ছত্রাক, আর যখন রাস্তার মাঝখানে কোনো মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়, কালো-কালো নির্লোম মুণ্ডু শকুন ঠুকরে খুলে ফ্যালে তাদের নাড়িভুঁড়ি যেন মে-দিবসের ফুলে সাজানো লাঠির ডগার ফিতে। খাঁড়ির জলে কেউ পড়বামাত্র ঝপ ক'রে তাকে আস্ত গিলে ফ্যালে এক রাক্ষুসে মাছ, প্রায় জোনাহর তিমির মতোই বিশাল, আর তার হাঁ-টা ঘাড় আর পেটের মাঝখানে কোথায় যেন তৈরি থাকে, দ্বীপে যাকে সবাই বলে হাঙর। খুদে-খুদে ঢালের মতো বৃহদাকার একেকটা মাকড়শা, আটবিঘৎ লম্বা সব সাপ, কাঁকড়া বিছে ও অন্য নানারকম নাছোড় পোকামাকড়। বস্তুত যখনই রুক্ষ লালমদ তার মগজে চ'ড়ে যায়, অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান সেই বেশ্যাপুত্র পশ্চিম ইণ্ডিসীকে প্রাণখুলে খিস্তি করে, এই জঘন্য দেশটায় আসতে সে-ই তাকে

উশকে দিয়েছিলো, যে-দেশটার যৎকিঞ্চিৎ সোনা কবেই কয়েকটা লোলুপ সবধর হাত বাগিয়ে নিয়েই উধাও হ'য়ে গিয়েছে। গরম যখন তার শরীরটায় আগুন ধরিয়ে দেয়, আর যখন মনে হয় গায়ের চামড়াটায় কেউ যেন গনগনে তপ্তলাল অঙ্গার মাখিয়ে দিয়েছে, সে তার দুঃখদুরবস্থা নিয়ে এতই মাথা ঘামায় যে তার রোগ-রোগ ভাব ওষুধ-খাই-খাই ভাব আরো ফুলে ওঠে, আর সে হ'য়ে ওঠে তার সেই পড়শিদের মতোই ঝগড়ুটে, যারা তাদের নিজেদের দুর্দশার ভাপেই সেদ্ধ হচ্ছে সারাক্ষণ; একরাত্রে, লাল মদ যখন তাকে বাড়াবাড়িরকম বেশামাল ক'রে তুলেছে, সে পাশায় ঠকাবার জন্যে জেনোয়ার জ্যাকোমে দে কাস্তেইওনকে আক্রমণ ক'রে বসলো—এক ঘা মারলে তাকে তার ছোরা দিয়ে আর রক্তাপ্লুত দেহটা পেড়ে ফেললে পাকস্থলি বিক্রেতার সুরুয়ার ডেকচির ওপর। ম'রেই গিয়েছে এই বিশ্বাসে, আর ঘাঘরা পরতে-পরতে তাদের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে-আসা নেগ্রো মাগিদের আর্তচীৎকারে ভয় পেয়ে, হুয়ান বেরিয়েই দেখতে পেলে বাইরে কাঠের বেড়ার গায়ে কার একটা ঘোড়া বাঁধা। সেটাকে পাকড়ে সে জাহাজঘাটার পাশের রাস্তা দিয়ে জোর কদমে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যতক্ষণ না স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ফুটলো দিনের আলো আর তালগাছ ঘেরা নীল ঘোড়া-গুলো দেখা গেলো সে আর ঘোড়া থামালে না। তাদের ওপাশে নিশ্চয়ই আছে জঙ্গল, সেখানে আত্মগোপন ক'রেই সে এড়াবে রাজ্যপালের দয়ামায়াহীন কঠোর বিচার।

ক-দিন ধরে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান সমানে রুক্ষ থেকে রুক্ষতর জমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো, আর শেষকালে তার ঘোড়া তার পায়ের নাল খুইয়ে বসলো। যখন সে আপের শেষ শ্বেতগুলো পেছনে ফেলে এলো, তার ডানদিকে ভয়াবহ মরীচিকার মতো উঠে দাঁড়ালো এক পাহাড়ের সার, দু-পাশে গোল খোঁচা-খোঁচা ছোটো পাহাড়, যেন জঙ্গলের পশমি কম্বল গায়ে ঘুমিয়ে আছে মস্ত-সব সারমেয়। ঢালের শাপলাভরা দিঘির মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে নেমে এসেছিলো এক জলধারা, ব'য়ে এনেছিলো পচা ফল বীজমুল আর খুদে-খুদে সব কালোচোখ মাছ, সেগুলো ঝিলিক মেরে স্রোতের উলটো দিকে যাবার চেষ্টা করছে; এই জলধারার তীর ধ'রে পলাতক উঠে এলো আরো ওপরে, যতক্ষণ না সে এসে পৌঁছুলো লালফুলে শোভিত এক গাছপালার বনে, যার আকশির মতো বেরিয়ে পড়া ডালেপালায় হামলা চালিয়েছে বল্মীকস্তূপের এক বিষব্রণ, প্রাণময়তায় যা কিলবিল করছে। কতগুলো ঝোপঝাড়কে দেখালো যেন গায়ে পেঁয়াজের খোশা প'রে আছে, অন্যগুলো নিচে নুয়ে পড়েছে

বিশাল-সব ইঁদুরের বাসার ভারে। হুয়ান তার ঘোড়াকে একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বাঁধলে, কারণ এখন তাকে শৈলশিরার চূড়ায় ওঠবার জন্যে বড়ো-বড়ো উবড়োখাবড়ো পাথর বেয়ে উঠতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে অন্যপাশটায় নামতে শুরু করলে, সেখানে জঙ্গল তেমন নিবিড় নয়, আর সমুদ্র ছড়িয়ে আছে তার পায়ের তলায়: ফেনাবিহীন এক সমুদ্র, গড়িয়ে পড়া নুড়িপাথরের বাজফাটা শব্দে ভরা ছায়া-ছায়া গুহায় চাপা ধাক্কা দিয়ে ম'রে যাচ্ছে তার ঢেউগুলো। সন্ধেবেলায় সে এসে পৌঁছুলো কড়ি, শাঁখে, ঝিনুকে ছাওয়া এক বেলাভূমিতে, যেখানে অনচ্ছ ফুলকো পোঁটকাগুলো খুদে-খুদে সিন্ধু শামুকের মধ্যে রৌদ্রে ম'রে যাচ্ছে, তামাটে সব আপেল আর মস্ত-সব গুয়ামোর খোলা যারা ষাঁড়ের মতো গ'র্জে উঠতে পারে। হুয়ান তার ফুশফুশ ভ'রে নিলে নোনা হাওয়ায়; সমুদ্রের টাটকা হাওয়া তার চোখে জল এনে দিলে, কারণ এ তাকে মনে করিয়ে দিলে তার চ'লে আসার দিনকার সান্‌লুকারের গন্ধ, মনে করিয়ে দিলে অ্যান্টওয়ার্পে তার চিলেকোঠা যার তলায় ছিলো মৎস্যবিক্রেতার দোকান—কিন্তু ঠিক তখনই নারকোল গাছগুলোর পেছনে ঘেউঘেউ ক'রে উঠলো এক কুকুর, আর ফিরে দাঁড়িয়ে পলাতক দেখতে পেলে তার দিকে একজন দাড়িওলা লোক একটা ছিলাটান গাদাধনুক তাগ ক'রে আছে।

আগন্তুক উদ্ধত একরোখাভাবে বললে: 'আমি ক্যালভিনপন্থী!'

'আর আমি একজন মানুষ খুন করেছি', বললে হুয়ান, এই চেষ্টায় যাতে যে-লোক এইমাত্র যে অধমতম অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, এই কথার মধ্যে দিয়ে যাতে তারই স্তরে নেমে আসতে পারে। দাড়িওলা তার ছিলা ঢিলে হ'য়ে যেতে দিলে, একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে তাকে নিরীক্ষণ করলে; তারপর সে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লে জনৈক গোলোমনকে—এক নেগ্রো, তার গাল কাটাচেরা—লাফিয়ে নেমে এলো এক গাছ থেকে, প্রায় হুয়ানের ঘাড়েই, আর তার টুপিটা তার মুখের ওপর এমন প্রচণ্ডভাবে টেনে নামালে যে চুড়োটা দু-ফাঁক হ'য়ে গেলো। এইভাবে, নিজেরই টুপিতে চোখ ঢাকা, তাকে হাঁটানো হ'লো।

৭

মেনেন্‌দেথ দে আভিলেস-এর বর্বরতায় ফরিডায় অন্তত ছয়শোজন ক্যালভিনপন্থীর শিরশ্ছেদ হয়েছিলো—এই কথাই বললে দাড়িওলা, দারুণ রাগি গলায়, তার বিশাল মুঠো দিয়ে ধর্মপুস্তক বাইবেলে চাপড় মেরে, আর সারাক্ষণ গোলোমন

একটু দূরে ব'সে একটা পাথরের ওপর তার মাশেতেতে শান দিলে। এই হুগেনট, রেনে দ্য লাঁদোনিয়েরের এক সাথী, আশ্চর্যভাবে, দৈব কৃপায় আরো তিরিশজন লোকের সঙ্গে বেঁচে গিয়েছে, তারপরে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে, বেশির ভাগই গেছে ইস্পানিওলার খোঁজে। আর পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির তত্ত্বের অর্থপ্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কোনো সৎগ্রীস্টানের কাছে যা আপত্তিকর মনে হ'তে পারে এমন নানা পাপ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে, সে বর্ণনা করলে অবাধ নিরঙ্কুশ নিধন, আর তার মধ্যে রইলো এমন-সব কাটাচেরার অনুপুঙ্খ, যার একটা এইরকম : কারু ঘাড়ে ভোঁতা বাঁকা কৃপাণ লেপটে ব'সে গিয়েছে, যেটা খোলা যায় কেবল করাৎ দিয়ে কেটেই, আর কশাইয়ের দায়ের মতো আওয়াজ ক'রে আরেকজনের শিরদাঁড়ায় পড়লো কুঠার ; এ-সব শুনে অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান ঘিনঘিনেভাবে মুখবিকৃতি ক'রে তার মাথা নিচু করলে, বোঝাতে চাইলে যে কিছু কম লাতিন বাক্য ব্যবহার ক'রে ঈশ্বর ও হেস্থক্রিস্তোকে স্তুতি করার জন্যে এ-শাস্তি মনে হয় বিষম কঠোর, বিশেষত এমন-এক দেশে যেখানে বলিরা সত্যি-বলতে কারুই কোনো ক্ষতি করছে না। দু-হাতে হাঁকানো তলোয়ারের এক প্রচণ্ড কোপে মুণ্ডুর সঙ্গে একজনের এমনকী বাম কাঁধটাও উড়ে গিয়েছিলো !

'আরেকজন তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হ'য়ে যাবার পরেও চারপায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলো—মদের ভিস্তির মতো ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত', প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গলায় বললে দাড়িওলা ; হুয়ান তার সঙ্গে ঝগড়া করুক এটাই তার ইচ্ছে, যাতে সে গোলোমনকে হুকুম দিতে পারে যে তার কণ্ঠার ওপর থেকে সবকিছু তার মাশেতের কোপে গোলোমন উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু অ্যান্টওয়ার্পের হুয়ান উত্তেজনার কোনো চিহ্নই দেখালে না। যদিও ফ্ল্যাণ্ডার্সে সে স্বচক্ষে দেখেছে স্ত্রীলোকদের জ্যান্ত গোর দিতে আর শত-শত লুটারপন্থীদের জ্যান্ত ঝলশে মারতে, আর সে এমনকী আগুন জ্বালাবার জন্যে কাঠ কুড়িয়ে এনে সে-সময় সাহায্যও করেছে, প্রটেস্টাণ্ট স্ত্রীলোকদের ছুঁড়ে ফেলেছে গর্তে, তবু সবকিছু এখন তার কাছে এই সন্ধ্যায় অন্য আলোয় প্রতিভাত হ'লো, বিশেষত এ-সন্ধ্যাটাই যখন তার জীবনের শেষ সন্ধ্যা হ'য়ে উঠতে পারে ; আর সব কিনা এমন-এক দেশে অকথ্য দুর্দশায় দিন কাটাবার পর, যে-দেশে হালজোয়াল শুদ্ধু একটা নতুন উদ্ভাবন, গম অজ্ঞাত, ঘোড়া পরম বিস্ময়, জিনলাগাম অশ্রুতপূর্ব, জলপাই আর আঙুরের দাম তুল্য ওজনের সোনায়, যেখানে ধর্মসভা বস্তুত নেগ্রোদের মূর্তিপূজাকে সামান্যই ধর্তব্যে আনে (যে-নেগ্রোগুলো এমনকী সত্তদেরও নির্ভুল নামে ডাকতে পারে না)

কিংবা লাদ্রিনোদের (যারা এখনও ইণ্ডিয়ান গান করে) কোনো পাত্তাও দেয় না, গ্রাহ্যও করে না সেইসব বিবেক-বিচার-বর্জিত যাজকদের যারা ইণ্ডিয়ান মেয়েদের ব'য়ে নিয়ে যায় নিজেদের কুটিরে আর এমনভাবে তাদের দীক্ষা দেয় যে ন-মাস পরে তারা আবার ফিরে আসে শয়তানের খপ্পর থেকে পিতঃ-র কাছে। তার কাছে এটা পেছনে, ঐ পুরোনো জগতে ঠিক এবং রীতিসম্মত মনে হয় যে লোকের সবসময় দিব্যমহিমা আর অবতারতত্ত্বের ধর্মমতসংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে যুদ্ধ করাই উচিত। কারণ এই দাড়িওলাটার মতো কাউকে যে আলবার ভিউক জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হুকুম দেয় সে শুধু এইজন্যেই যে সেখানে ধর্মদ্রোহীরা রাজা ফিলিপের বিরুদ্ধে একেকটা আস্ত প্রদেশকে খেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে, সেই ফিলিপ যিনি কিনা ক্যাথলিকবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ও দিবাদ্বিপ্রহরের দানব, আসলে ঐ বহ্ন্যুৎসব স্বষ্ঠু রাজ্যচালনারই অঙ্গ। কিন্তু এখানে সে আছে পলাতক সব গোলামদের মধ্যে। সে তো নিজেই পালাচ্ছে, কারণ সে নিজে একটা দুষ্কর্ম করেছে ; সেও এই ক্যালভিনপন্থীর মতো পলাতক, যার পলায়নসঙ্গীদের একজন সদ্য খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে—এতই সম্প্রতি, যে সে ভুলেই বসেছে তার বাপ্তিস্ম, আর হাবানা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে এই কারণে যে সে বিশপকে বলেছিলো ক্যাথিড্রালে ধাতুপট্টারৃত যে-সব ধর্মবস্তু খাঁটি ব'লে বিক্রি করা হয় আসলে সেগুলোর কানাকড়িও দাম নেই, বিশপকে তার জন্যে প্রকাশ্যে দোষারোপ ক'রে সে চেয়েছিলো খাঁটি নিরেট সোনায় দাম পেতে। অতএব রাজ্যপালের কঠোর বিচার থেকে পালিয়ে এসে হুয়ান আশ্রয় পেলে এই ক্যালভিনপন্থী আর এই মারানোর কাছে, আর পেলে অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঘটাবার উষ্ণতাও। আর স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও। কারণ গোলোমন যখন আখের খেতের খামার থেকে পালিয়ে-আসা একদল দাসকে নিয়ে এলো, ডালকুত্তাগুলো পথে তাদের কয়েকজনকে পাকড়েছিলো, পরে যাদের প্রভুরা প্রাণদণ্ড দেয়। কিন্তু স্ত্রীলোকরা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছিলো সামনে, এসে পৌঁছেছিলো জঙ্গলে। কাজেই অ্যান্টওয়ার্পের ঢাকবাদক হুয়ানের এখন দু-দুজন নেগ্রো স্ত্রীলোক আছে, শুধু তারই সেবা করার জন্যে, আর যখনই তার কামের তাড়া চেতিয়ে ওঠে তাকে চরিতার্থ করবার জন্যে। লম্বাজন বিপুলস্তনী, তার কেশ আট সিঁথিতে ভাগ-করা, তাকে সে ডাকে দোনিয়া মান্দিঙ্গা। বেঁটেজনকে, যার নিতম্ব বেরিয়ে থাকে গির্জের দেয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা গায়েনদের আসনের মতো, যার সেখানে মাত্র কয়েকটাই চুল আছে যেখানে কোনো সৎ খ্রীস্টানির থাকে পুরু গোছা-

গোছা চুল, তার নাম সে দিলে দোনিয়া যোলোফা। দোনিয়া মান্দিঙ্গা আর দোনিয়া যোলোফা যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এমনকী শিকবসানো তন্দুরে শিকে মাছ গেঁথে শেঁকবার সময়ও তারা ঝগড়া করে না। আর তাই দিন কেটে যায় বুনো বরা বা হরিণের মাংস নুন মাখিয়ে শুকিয়ে, আর ইণ্ডিয়ান ভুট্টার শীষগুলো ভাঁড়ারে তুলে জমিয়ে রেখে। সময় কাটে ধীরে, মন্থর; যে-দেশে সারা বছরই গাছগুলো তাদের পাতা ঝরায় সেখানে একটা দিন ঠিক গত দিনটার মতোই; আর তারা প্রহর মাপে ছায়ার নড়াচড়া দেখে। যখন অন্ধকার নামে, গোঁয়াড়ের মধ্যে যারা থাকে তাদের দখল ক'রে নেয় এক গভীরগম্ভীর বিষাদ। প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় সে যেন কী কথা মনে করবার চেষ্টা করছে, অনুভব করছে পিছুটান, খেদ, বিধুর মনস্তাপ, শুধু নেগ্রো মেয়েরা গান করে, কাঠের আগুনের ধোঁয়ায়, খামারের গন্ধগুলা ভাপকুয়াশার মতো যা শান্ত সমুদ্রের ওপর ঝুলে থাকে। অ্যাণ্টওয়ার্পের হুয়ান তার টুপি খুলে নেয়, আর ঢেউয়ের দিকে মুখ ক'রে জপ করে সদাপ্রভুর স্তব আর আত্মমন্ত্র, তার গভীর খাদেনামানো স্বর যেন শপথ ক'রে ঘোষণা ক'রে দেয় পাপের ক্ষমা, দেহের পুনরুত্থান ও চিরজাগরূক প্রাণ সম্বন্ধে তার গভীর বিশ্বাস। একটু দূরে, ক্যালভিনপন্থী বিড়বিড় করে জেনিভার বাইবেলের শ্লোক; আর মাঝরানো—দোনিয়া মান্দিঙ্গা আর দোনিয়া যোলোফার নগ্ন দেহের দিকে তার পেছন ফেরানো—চাপা অশ্রুত কম্পমান স্বরে আবৃত্তি করে দাউদের মহাগীতগুলির একটা: 'হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়ায় ও সত্যে মহান্ [গীতসংহিতা: ৮৬/১৫।' চাঁদ ওঠে, আর খোঁয়াড়ের কুকুর-গুলো সবাই বালির ওপর ব'সে গলা মিলিয়ে ডুকরে ওঠে। সমুদ্র তার নুড়িগুলো তীরের ধারে-ধারে গুহায় গড়িয়ে দেয়। আর যখন সব প্রার্থনা শেষ হয়, য়িহুদি ক্যালভিনপন্থীকে তিরস্কার করে তাশের জুয়োয় ঠকাবার জন্যে, আর তিন মরদই ঘুঘোঘুষি লাগিয়ে দেয়, এ ওকে মারে, ও এর ওপর গড়িয়ে পড়ে, কুস্তি করে এ ওর সঙ্গে, হেঁকে বলে ছুরি আনতে তলোয়ার আনতে, কিন্তু কেউই তা এনে দেয় না, আর পরে আবার মিটমাট ক'রে নেয় তারা, কান থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে হো-হো ক'রে হাসে। তাদের যেহেতু কোনো টাকা নেই তারা জুয়ো খেলে কড়ি আর ঝিনুক দিয়ে।

৮

কিন্তু মাসের পর অগুনতি মাস কেটে যাবার পর হুয়ান সারাক্ষণ মনমরা হ'য়ে

থেকে-থেকে অসুখ বাঁধিয়ে বসলো। দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গা মস্ত সব তালপাতা নেড়ে-নেড়ে তাকে হাওয়া করে, আর সেই মরশুমে গরান-গাছের জঙ্গল থেকে যে-খুদে-খুদে মাছিগুলো উড়ে আসে তাদের তাড়িয়ে দেয়; ইণ্ডিয়ানরা তার জন্যে নিয়ে আসে দারুণ-সব মুখরোচক মাছ, তীরের গুহাগোঁদলে মশাল জেলে মাছগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তারা তাদের ধরে। একটা হাড় থেকে মজ্জা বার ক'রে সাফ ক'রে নিয়ে নল বানিয়ে অ্যাণ্টওয়ার্পের ঢাকবাদক ঘণ্টার পর ঘণ্টা তামাক টানে আর বিধুরভাবে স্মৃতির মধ্যে হাংড়ায় সেইসব দিনের কথা যখন সে শহরগুলোয় ঢুকতো ঝাণ্ডাবাহকের পাশে-পাশে, তূরীভেরী আর বক্সউড ফাইফের স্বরে যখন তারা পা মিলিয়ে এগুতো, হৃদয়-আঁকা সবুজ সব খড়খড়ি খুলে যেতো, ফুলভরা গোবরাট থেকে ঝুঁকে দেখতো তরুণীরা, তাদের বুকের জামার ঝালরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া গোলাপি স্তনগুলো যেন নিবেদন করতো তাদের—কারণ ইতালি, কাস্তিইয় আর ফ্ল্যাণ্ডার্সের মেয়েরাই হ'লো সত্যিকার মেয়ে—এইসব বচসাপ্রিয় নেগ্রো মাগিগুলোর চাইতে অনেক আলাদা: এই মদিরামশকগুলোর মাংস এমনই রুক্ষ কঠিন যে চিমটিও কাটা যায় না—অথচ এদেরই এখানে চালানো হয় রমণী ব'লে, কামিনী ব'লে। যে-লোক এককালে আলকালার বিদ্যালয়ে গিয়েছে, সে কী ক'রে তার বিশ্বভ্রমণকালে যে-সব হাজার-হাজার জিনিশ দেখেছে শুনেছে শিখেছে, তার কথা এই আলকাংরা-কালো প্রাণীগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে? এরা শুধু জানে এদের বর্বর ঢাক-গুলো পেটাতে, আর তার সঙ্গে একটা-দুটো এমন অর্থহীন গান জুড়ে দেয়; যখন তারা তাদের তম্বুরা ঝাঁকিয়ে এই ধরনের স্তবগান ধরে, আর গোলোমনের গলা ছেড়ে গাওয়া একক গানে যোগ দেয়, বিদ্যার্থী হুয়ান তার অসন্তোষের চিহ্ন হিশেবে কুকুরগুলো নিয়ে জঙ্গলে চ'লে যায়। কারণ হুয়ান সত্যি বিদ্যার্থী ছিলো একদিন—এ-কথাই সে বলেছে দাড়িওলা আর য়িহুদিকে—আর দিব্য-কুমারী সংক্রান্ত সাংগীতিক স্বরলিপির সঙ্গে-সঙ্গে শিখেছিলো সপ্তবিদ্যার প্রধান চারটে বিষয় অর্থাৎ সংগীত, জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা; শিখেছিলো হার্প আর ভিহুয়েলা আর সুরের পর্দা থেকে পর্দায় যাবার তত্ত্ব, একই সুরের ভিন্ন রূপ আর ভিন্নভিন্ন সুর মিশিয়ে সংগীতরচনা করে কীভাবে—নিছক সরল স্তবগান আর অর্গ্যান বাজানোর কথা না-হয় না-ই বলা গেলো। আর বেলাভূমিতে যেহেতু কোনো স্পিনেৎ বা ভিহুয়েলা নেই, হুয়ান শুধু কথায় আর গুনগুন ক'রে সুর ভেঁজে দেখিয়ে দেয় কী ক'রে কেউ রচনা করতে পারে কোনো পাভান-এর

ভিন্নস্বর কিংবা অলংকৃত করতে পারে কোন্‌দে ক্লারো বা মিরামে কোমো ঝোরোর স্বর, এখন দরবারে যেমন বাহবা পায় শৌখিন-সব ফরাশি বা ইতালীয় শৈলী তার মিড়গমকমূর্ছনায়। তার সব গুণপনার এই প্রদর্শনীতে পলাতকের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে অন্যরা এখন তাকে কোনো সামন্তবীরের প্রধান অনুচরের ছেলে ব'লেই ভাবে, যে দারিদ্র সহ্য করে আত্মমর্যাদার সঙ্গে, তবু যে কোনো শাবেক বনেদি বাড়ি বিক্রি করবে না—যার ফটকটা যে-কেউ দেখতে পারে, ঐ গাছটার থেকে খুব দূরে হবে না—আর তারা সবাই সেদিকে তাকায়—সান্ ইল্‌দেফোনসোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে, যার ছাত্রদের জীবন যাপন এই ঢাকবাদক রোজই আরো প্রেরণাদীপ্ত আর আনুষঙ্গিক অনুপুঙ্খ সমেত তাদের বর্ণনা ক'রে শোনায়। সত্যি-যে, সে সৈন্য হিশেবে নাম লিখিয়েছে, কারণ রাজাকে সেবা করবার জন্যে সে দায়বদ্ধ ছিলো, যেমন তার সব পূর্বপুরুষই রাজসেবায় জীবন অতিবাহিত করেছে, সেই সুদূর সময় থেকে যখন তারা অংশ নিয়েছিলো শার্লমেনের অভিযানে। এইভাবে তার বংশলতিকাকে মহিমাদীপ্ত ক'রে সে অত কড়ি-শাঁখ আর অত বাজে রান্না-করা কাছিম আর ক্যালভিনপন্থীর তন্দুরে ঝলশানো কাবাব খাবার একঘেয়েমি প্রশমিত করে। প্রায় কষ্টদায়ক তাড়নার সঙ্গে তার জিভ আর টাগরা চায় মদ, আর যখন তার মন বেঘোরে ঘুরে বেড়ায় কাল্পনিক সব কাবাবের দোকানে, সে মনে-মনে ছবি আঁকে বিশাল-সব টেবিলের, যেখানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে তিতির, খাশিমোরগ, তুর্কিমোরগ, বাছুরের ঠ্যাং, মস্ত গর্ত-গর্ত পনীর, আচারে জারানো মাছের থালা, পুডিং, মোরব্বা আর আলকারিয়ার মধু। কিন্তু এই থোঁয়াড়ে শুধু হুয়ান একাই অতীতের কথা ভেবে-ভেবে গুমরায় না, যদিও নেগ্রো আর ইণ্ডিয়ানরা র‍্যাঞ্চ মালিকের মাস্টিফ কুকুরগুলোর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে পেরে বেশ খুশিই থাকে, খুশি থাকে অন্যসব মেয়ে আর কুব্জ্বরীদের মধ্যে থাকতে পেরে, যারা সব সময়েই জন্ম দিয়ে চলেছে। য়িহুদি স্বপ্ন দেখছে তোলেদোর ঘেটোর, যেখানে সে শান্তিতে কাটিয়েছিলো কত-কত বছর, যেখানে বিয়ের উৎসবে ফুর্তি লোটা যায় গীতবাদ্যে, কিংবা শোনা যায় প্রজ্ঞাবানেদের যখন তাঁরা তাঁদের সন্দর্ভ প'ড়ে শোনান, যেখানে ঘর ধুয়ে যায় না অশ্রু বা রক্তয়, অতীতের নির্যাতনে লাঞ্ছনায়। চোখ বুজলেই মাররানো দেখতে পায় সরু অলিগলি, বাম দিকে লণ্ঠন আর ছুরি-নির্মাতাদের কারখানা, কাছেই রুটিকেকের দোকান, তাদের ফোলানো পেস্ট্রি, আখরোটের রুটির আংটি আর স্ফটিক জামিরগোলা। মা-বাবা বলাবলি করে

শুদ্ধ বাহ্যিক প্রচলিত বদল, আর অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের ছেলেমেয়েদের শেখায় কোনো কায়িক দক্ষতা, সেই সঙ্গে তাদের পড়ায় তোরাহ্; কোনো ছেলে যদি তার তুতোভাই মোসের মতো কোনো তুলাদণ্ডনির্মাতা হ'তে না-চায়, তবে সে যাতে কাজ করতে পারে প্রবালে কিংবা আঁকতে পারে খেলার তাশ ইসাক আলফানদারির মতো, কিংবা অন্য তুতোভাই মানাহেন-এর মতো হ'য়ে উঠতে পারে বিখ্যাত রৌপ্যকার, কিংবা আয়ত্তে আনতে পারে ক্ষতনিরাময় শিল্প, তার আত্মীয় রাবাই ইয়ুদার মতো। গ্রীস্টান অন্ত্যেষ্টিতে অর্থের জন্যে বিলাপ গাইবে য়িহুদিপত্নী, আর কারখানা ঘর ও দোকান থেকে বিরামহীন শোনা যাবে গণনাযন্ত্রের ওপর পুঁতি সরাবার চাপা মৃদু সুন্দর গান। য়িহুদি স্বপ্ন দেখছিলো ঘেটোর, আর দাড়িওলা পারীর, যাকে সে দাবি করে তার জন্মনগরী ব'লে, যদিও তার জন্ম হয়েছিলো রুয়েঁর শহরতলিতে, আর এক কাঠ ব্যবসায়ীর বজরায় মাত্র এক হপ্তাই সে শাৎলেৎ-এর দেয়ালের তলায় ক্যাবিনবয় হিশেবে কাটিয়েছিলো। কিন্তু সেই এক হপ্তাই তার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা ছিলো: একটা ভারি সুন্দর সেতুর ওপর একটা দুর্দান্ত প্রহসন নামিয়েছে অভিনেতারা, আর মঁৎফোকঁর ফাঁসির মঞ্চের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবা গেছে বিশ্বের যত অসার অহমিকা ও দম্ভর কথা, আর মাদেলীন আর মুলের মোড়ে শুঁড়িখানায় চেখে দেখা গেছে মদ। বুনো জন্তুতে ভরা এই হাবরে দেশটাকে শাপ দিতে-দিতে সে ঘোষণা করলে পারীর সঙ্গে তুলনা হয় এমন-কোনো জায়গাই কোথাও নেই; নিছক ফেরেব্বাজদের ধাপ্পা-বাজিতে ভুলেই কেউ এখানে আসে, আর শেষবিহীন জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করে—কেন? না, এই আশায় যে যেখানে গমের একটা অঙ্কুরও মেলে না সেখানে যদি আচমকা তাল-তাল সোনা পাওয়া যায়! সে কেবলই বলে হালকা সোনালি চুলের মেয়েদের কথা, ফেনিল আপেলরসের কথা, আর বলে এক হাঁসের কথা আঙুরলতার আগুনে যে নিজের ঘাম ঝরিয়ে নিজের রসেই ঝলসাচ্ছে—এ-সব শুনতে-শুনতে অবশেষে ঢাকবাদকের মেজাজ যায় বিগড়ে, পিত্তি চটকে যায়, সে খিস্তি করে গোলোমনকে আলস্যের জন্যে যখন (এত-সব সাতকাহন শুনে) সেও বিশৃঙ্খলভাবে শুরু ক'রে দেয় তার নিজের পূর্বপুরুষদের কাহিনী শোনাতে, কেমন ক'রে কবে তাদের হৃতমান করা হ'লো গায়ে তপ্তলাল লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে। তারা সবাই ছিলো—কেউকেটা, সম্ভ্রান্ত বলে—নেগ্রো; যদিও নিজের দেশের কথা ভাবলেই তার শুধু মনে পড়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণি আর ঝর্ঝর ভরা এক বিশালবিপুল নদী, আর মাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে তৈরি-করা গুটিকয় কুঁড়ে বাড়ি; নেগ্রো বর্ণনা করে

এমন-এক জগৎ যেখানে তার বাবার মাথায় শোভা পেতো পালকখচিত এক মুকুট, আর শাদাঘোড়ায় টানা এক গাড়িতে চ'ড়ে বাবা যেতো, ঠিক তাঁরই মতো সেভিয়েতে ভোজ পরবের দিনে যেমনভাবে আলামেদায় গাড়ি হাঁকিয়ে যেতেন মেদিনা সিদোনিয়াস। সবাই তারা মনখারাপ ক'রে যে যার স্বপ্নের পিছু নেয় নাছোড়, আর তাদের পাশে কাঁকড়ারা গড়িয়ে দেয় শুকনো নারকোলের খোল। তারা চিবোয় সমুদ্রের ধারের ঝোপের ছোটো-ছোটো লাল ফল, যার স্বাদ খানিকটা আঙুরেরই মতো, আর ভুট্টার আর চিচার স্বাদে ক্লান্ত তাদের মুখে এনে দেয় মদের স্বাদ। যে-সব জিনিশ তারা শুধু চিরকাল কামনাই করেছে, কল্পনাই করেছে, তাতেই তাদের মন ভর্তি—কখনও তারা এ-সব সত্যি পায়নি—আর আচমকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে মুষলধারে, সঙ্গে নিয়ে আসে গা-জালানো ধুঁয়াধার পোকামাকড়। যখন ছাখে যে ছোট্ট কালো মশামাছির মেঘ তাকে ঘিরে ধরেছে, কানের কাছে ভনভন করছে, হুয়ান শুধু পা ঠুকে-ঠুকে রাগে চ্যাঁচায়, নিজের গালে সজোরে চাপড় মেরে ছাখে যে তারই রক্তে এরা সব টৈটুম্বুর হ'য়ে আছে। একদিন সকালে সে জেগে উঠলো কাঁপুনি দিয়ে, সারা মুখটা যেন মোমে তৈরি আর তপ্তলাল ডোরা তার বুকে। দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিন্দা পাহাড়ে গেলো সেইসব ভেষজেরই সন্ধানে যা শুধু জনৈক অরণ্যদেবই দিতে পারেন, যিনি নিশ্চয়ই এই আইনবিহীন বর্বর দেশটার আরো-এক শয়তান বাসিন্দা। তাদের তৈরি পাচন গেলা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই; কিন্তু ঘুমের মধ্যে রুগী একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলে: হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার দোলখাটিয়ার সামনে কোম্পোস্তেলার ক্যাথিড্রালকে, তার মিনারগুলো উঠে গিয়েছে আকাশে। বিকারের ঘোরে তার মনে হ'লো ঘণ্টাঘরগুলো এত উঁচুতে উঠে গিয়েছে যে যেন মেঘের মধ্যেই হারিয়ে গেছে, নিশ্চল ডানা মেলে যে-শকুনগুলো হাওয়ায় উড়ছে তাদেরও ঢের ওপরে, শকুনগুলোকে দেখাচ্ছে যেন নভোমণ্ডলের জলে ভাসা দুর্লক্ষণের কতগুলো কালো ক্রুশের মতো। যদিও বেলা এখন দুপুর, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে এমন স্বচ্ছপ্রাঞ্জল যে পোতিকা দে লা গ্লোরিয়ার ওপর তারকাখচিত আকাশকে দেখাচ্ছে কোনো দেবদূতের টেবিলঢাকার মতো। হুয়ান দেখতে পেলে নিজেকে—সে যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরেকজন লোককে যেমন সে দেখতে পেতো—সে এগিয়ে যাচ্ছে পবিত্র প্রাসাদের দিকে, একা, সেই তীর্থযাত্রীর শহরে অদ্ভুত নিঃসঙ্গ, কড়িবসানো এক ঢোলা আংরাখা গায়ে, তার হাতের লাঠি ভর দিয়ে আছে ধুসর সব খোয়া-পাথরে। কিন্তু দরজাগুলো তার সামনে বন্ধ। সে

ভেতরে যেতে চাচ্ছে, অথচ কিছুতেই পারছে না। সে গলা ফাটিয়ে হাঁক দিচ্ছে, কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পাচ্ছে না। তীর্থযাত্রী হুয়ান হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রার্থনা করছে, গোঙাচ্ছে, দিব্য কাঠে আঁচড়াচ্ছে, কোনো ভূতঝাড়ানো আত্মার মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে ভুঁয়ে। ভেতরে যাবে ব'লে কত তার অনুনয়, কত তার কাকুতি-মিনতি। 'সান্ তিয়াগো!' সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, 'সেণ্ট জেমস!' তারপরেই সে খাবি খাচ্ছে একরাশ নোনা জলে, হাবুডুবু; নিজেকে সে দেখতে পেলে সমুদ্রতীরে নোঙর বাঁধা এক জাহাজের কাছে গিয়ে কাতরভাবে ভিক্ষে করছে ওঠবার অনুমতি, যদিও একটা পচা কাঠের ডাল ছাড়া অন্যকেউ আর-কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হুয়ান এত তিক্ত আকুল অঝোর কাঁদলো যে গোলোমন তাকে তার দোলখাটিয়ায় লিয়ানা দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হ'লো, আর সেখানে সে প'ড়ে রইলো মড়ার মতো। আর যখন সে তার আচ্ছন্ন চোখ খুললে সন্ধেয়, ধোঁয়াড়ে তখন কোলাহল উত্তেজনা হৈ-হৈ। তীরের উলটো দিকের শৈলশ্রেণীতে এক জাহাজ এসে ঠেকেছে, দুর্ঘটনায় কাতর এক পোত, বারমুড়ার ঝড়তুফান যার কাঠামোটার হাড়পাঁজরা বার ক'রে দিয়েছে। মাঝিমাল্লাদের সাহায্য চাওয়া কাতর স্বর হাওয়ায় ভাসিয়ে আনা হ'লো তাদের কাছে। গোলোমন আর দাড়িওলা জলে ক্যানু নামিয়ে ঠেলে দিলে, আর মাররানো গিয়ে নিয়ে এলো দাঁড়গুলো।

৯

ঊষাকালে আকাশে ফুটে উঠলো ভাইদের আকার, নীল আবছায়া একটা বিশাল পর্বতের মতো। দাড়িওলা—সে এখন ভান করছে সে বার্গাণ্ডির এক গ্রীস্টান, ইণ্ডিসে যাবার জন্যে স্বয়ং রাজার অনুজ্ঞাপত্র পেয়েছিলো (পৌঁছেই সে সেটা দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো)—সে জানতো যে তার সব ভ্রমণ অচিরেই সাঙ্গ হ'য়ে যাবে। গ্র্যাণ্ড ক্যানারি যেহেতু ইংরেজ আর ফ্লেমিশদের সঙ্গে ব্যাবসা চালায়, আর বেশকিছু ক্যালভিনপন্থী বা লুটারবাদী কাপ্তেন সেখানে তাদের মাল খালাশ করে, এবং সেখানে যেহেতু কেউ তোমাকে জিগেশ করে না তুমি পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তি-বিধানে বিশ্বাস করো কিনা অথবা লোট-এর সময় উপোশ করো কিনা অথবা দলিলদস্তাবেজের জন্যে শস্তা শীলমোহর কিনতে চাও কিনা, সে জানতো যে এই শহরে তার পক্ষে হারিয়ে-যাওয়া খুবই সহজ হ'য়ে যাবে, তারপর দ্বীপটা থেকে চম্পট দিয়ে ফ্রান্সে যাবার একটা-না-একটা সুযোগ জুটেই যাবে। হুয়ানের

দিকে সে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে তাকায়, কিন্তু তারা দুজনেই যা জানে তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। এদিকে মুশুরির সুরুয়া, কিংবা মাংসের কিমা, কিংবা আন্-চোভি দিয়ে তৈরি ডিম-পেঁয়াজের স্যালাদ, পনীর আর আচার পুনরাবিষ্কার করার প্রফুল্লতা ছিলো, ধোঁয়াড়ে থাকার সময় যার জন্যে তারা বড্ড-বেশি হা-পিত্যেশ ক'রে থাকতো। তারা পেছনে ফেলে এসেছে দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিদ্দাকে, শোকের নয়—ক্রোধের অশ্রুজলেই ভাসিয়ে; যখন এরা আবিষ্কার করেছিলো যে এরা নেহাৎ হেজিপেজি নয়, বরং স্বয়ং এক সামন্তবীরের পার্শ্বচরের উপপত্নী, অন্য নেগ্রো মাগিদের সঙ্গে তারা এমন ব্যবহার শুরু ক'রে দিয়েছিলো যে এরা যেন কাস্তিইয়ের ভদ্র মেয়েমানুষ। জাহাজে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই রুগী অনুভব করলে যে তার শরীরে ফের স্বাস্থ্য ফিরে আসছে; জাহাজ শেষটায় নোঙর ফেললে সান্লুথারে, যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলো তীর্থযাত্রীর আংরাখা আর চপ্পল—কারণ মানৎ হ'লো মানৎ হ'লো মানৎ, আর নিজের মানৎ পালন করেনি ব'লেই তো এত-সব দুর্ভাগ্য তার ওপর বর্ষিত হয়েছে। এবং এখন যখন সে সমুদ্রে দীর্ঘ-সব সপ্তাহ কাটিয়ে সত্যি-সত্যি ডাঙায় পা দিতে যাচ্ছে, তখন বেওনের ধর্মশালায় সেবার হাত-মুখ ধোবার পর তার যেমন সুখী লেগেছিলো, এখন তার তেমনি সুখী লাগছে ব'লে মনে হ'লো। হঠাৎ তার মাথায় এ-ভাবনাটা খেলে গেলো যে যেহেতু সে পশ্চিম ইণ্ডিসে গিয়েছিলো তাই এখন সে নিশ্চয়ই একজন পশ্চিম ইণ্ডিসী। ফলে যখন সে ডাঙায় পা দেবে, সে হ'য়ে উঠবে পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান। এমনি সময়েই সে শুনতে পেলে মাঝিমাল্লার এক তুমুল হৈ-হল্লা, জাহাজের পেছনকার উঁচু মাচাটায়; তারা বুঝি আগমন উদ্‌যাপন করছে এই ভেবে সে ছুটে গেলো দেখতে, আর তাকে অনুসরণ ক'রে এলো দাড়িওলা। কিন্তু সেখানে যা ঘটছিলো তা মোটেই কোনো হাসির ব্যাপার নয়: নয়া গ্রীস্টানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই বেশ রুক্ষ রূঢ়ভাবে ঠেলাঠেলি করছে। একজন তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলে মেঝেয়, তারপর তার ঘেটি ধ'রে তাকে জোর ক'রে হাঁটু মুড়ে বসালে: 'সদাপ্রভুর স্তব!' চীৎকার করলে সে তার মুখের কাছে মুখ এনে, 'সদাপ্রভুর স্তব আর তারপর আভে মারিয়া!' আর হুয়ান বুঝতে পারলে যে মাল্লারা বেশ-কিছুদিন ধ'রেই মাররানোর ওপর গোপনে নজর রাখছিলো, আর শেষটায় রাঁধুনির কাছ থেকে জানতে পেরেছে—সে বাসন মাজার ভান ক'রে নিজের জন্যে কিছু ময়দা চুরি ক'রে নিয়েছে খমির বা কিণ্ব না-মেশানো রুটি বানাবে ব'লে। আর আজ যেহেতু শনিবার, তারা খেয়াল করেছে যে সে খুব

ভোরে উঠে স্নান ক'রে ধোয়া জামাকাপড় পরেছে। 'সদাপ্রভুর স্তব!' সব্বাই তারা চ্যাঁচাচ্ছে এখন। সেই সঙ্গে তাকে বেধড়ক লাথি কষাচ্ছে, আর মাররানো কিঁউ কিঁউ ক'রে বন্য সব মিনতি করছে। কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছে না, আর যখন তারা তাকে জটপাকানো গেরোবাঁধা একটা দড়ি দিয়ে চাবকালে, সে বিড়বিড় ক'রে যা বকতে শুরু করলে তা মোটেই সদাপ্রভুর স্তব বা আভে মারিয়া নয়, বরং দাউদের মহাগীত যা সে ধোঁয়াড়ে থাকার সময় দিনে তিনবার গুনগুন করতো: 'হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়ায় ও সত্যে মহান্…' সে তার কথা শেষ করবার আগেই তারা সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে লাথি কষাতে শুরু করলে, আর একজন ছুটে গেলো লোহার শেকলবেড়ি আনতে। আর যেই তাকে বেড়িশেকল পরানো হ'লো, যেই সে থু-থু ক'রে মুখ থেকে ফেললে ভাঙা দাঁতগুলো—যেগুলো তারা ভেঙেছে লাঠির ঘায়ে, তারা সবাই এবার দাড়িওলাকে ঘিরে ধরলে, খোলের কিনারে তাকে ঠেশে চেপে ধ'রে তাকে তারা ডাকলে লুটারবাদী বোম্বেটে ব'লে। কিন্তু সে তেরিয়া হয়ে দাঁড়ালে তাদের সামনে, দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলে সব অভিযোগের, পরিষদে গিয়ে তাদের নামে নালিশ করবে ব'লে ভয় দেখালে; এতটাই গলা চড়িয়ে সে কথা বললে সারেঙ শেষটায় একটু সংশয়ে প'ড়ে গেলো, আর সবাইকে শান্ত হ'তে বললো। কিছুক্ষণ দোনোমনা ক'রে সে ঠিক করলে স্বয়ংবর্ণিত বার্গাণ্ডিবাসীকে সে লাস্ পাল্মাসের বিচারসভার হাতে তুলে দেবে—তারাই না-হয় ঠিক করুক তাকে পশ্চিম ইণ্ডিসে যেতে দেয়া হবে কিনা। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, দাড়িওলা দেখলে তার হাঁটুতে বেড়ি পরানো হ'লো; দেখলে যে তারা উপহাস আর গালাগাল করতে-করতে নিয়ে গেলো মাররানোকে, বাল্‌তি-বাল্‌তি নোংরা জল ঢেলে দিলে তার মুখে। এর সঙ্গে তারা এমনই রূঢ় রুক্ষ ব্যবহার করেছে যে এ তার পেছনে রেখে গেছে রুধিররেখা। হুয়ান দেখলে তারা একে জোড়া মইয়ের একটা দিয়ে ঠেলে নামালে আর এর শেষ হতাশ মরিয়া আর্তচীৎকারের মধ্যে ঘুলঘুলির ঢাকা বন্ধ ক'রে দিলে। সে তখন সদ্য জানতে পেরেছে যে গ্র্যাণ্ড ক্যানারি—এককালে যেখানে মুর ও নব্যদীক্ষিতরা শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারতো—এখন ক্যাথলিকবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রচারকদের প্রধান পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি হ'য়ে উঠেছে; ধর্মসভার এক দুর্দান্ত হুমকিতে মূর্ত হয়েছে এই ফতোয়া যে লাস্ পাল্মাসে ধর্মসভার সবুজ ক্রুশ বসিয়ে জাহাজের মাঝিমাল্লাকে অব্দি সন্দেহ হ'লে পাকড়ানো হবে। তার বন্দীশালার খুপরিগুলো ওলন্দাজ সারেঙ আর অ্যাংলিক্যান

কাপ্তেনে ভর্তি—ধর্মনিরপেক্ষ বাহিনীর হাতে তুলে দেবার প্রতীক্ষায় আছে। আগ-মাস্তুলের তলায় উবু হ'য়ে ব'সে গোলোমন যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপছে, আতঙ্কে ভ'রে গিয়েছে সে, যার নাম তার আগে ছাঁকা দিয়ে খোদাই করা তার সেই প্রভুর আসিয়েন্দায় সে যখন আমাদের সদাপ্রভু হেস্থক্রিস্তোর কাছে প্রার্থনা করতো, সে তখন ত্রাণকর্তাকে নাম ধ'রে ডেকেছিলো কিনা, নাকি তাঁর পুজো করেছিলো তার নিজের ভাষায়, গোড়ায় তার গলায় অনেক-সব পুঁতির মালা জড়িয়ে নিয়ে। তার কাঁধ চাপড়ে হুয়ান তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলে, যেমন কেউ করে কোনো ভালো পোষা কুকুরকে; কিন্তু তাকে সে এটা বলতে পারলে না—পাছে কেউ শুনে ফ্যালে—যে বিখ্যাত-সব শিরশ্ছেদের দিনে ইন্‌কুইজিটররা নিছক কোনো নেগ্রোকে পোড়াতে গিয়ে কাঠকুটো খুব-একটা খরচ করবে ব'লে মনে হয় না, বিশেষত যখন সহজেই হাতে পাবে কোনো পণ্ডিতকে যিনি বড্ড-বেশি আরবী জানেন, অথবা পাবে কানখাড়া-সব তান্ত্রিকদের, প্রটেস্টাণ্টদের—আর ওলন্দাজ জাহাজগুলো যেখানে ভেড়ে, সেখানে ধর্মদ্রোহী একটা পুঁথি হাতে-হাতে ঘোরে, প্রচার হয়, যার নাম 'মূর্খ কাজের প্রশংসায়' অথবা 'উন্মত্ততার বাহবা' বা ঐ ধরনেরই কোনোকিছু। আর শিগগিরই যেহেতু ত্রিমূর্তির রবিবার হবে, পোপ-বিরোধীদের জীবন্ত দাহনের জন্যে যেটা খুবই চমৎকার দিন, পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান মনশ্চক্ষুতে এক্ষুনি দেখতে পেলে মাররানোকে, কালো আশীর্বাদী পরা, আর হলদে আংরাখা পরা দাড়িওলা যার আংরাখার সামনে-পেছনে শেলাই-করা থাকবে সান্ অ্যান্‌দ্রেস-এর লাল ক্রুশ। ঝাণ্ডাদণ্ডের তলায় আশিস পাবার পর দুজনেই উঠবে যে যার উলটো গাধায়, চল্লিশ দিনের ইচ্ছাপূরণের জন্যে দূর-দূর থেকে যারা এসেছে তাদের শোরগোল আর টিপ্পনীর মধ্যে, আর তাদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জলন্ত চিতার দিকে, আরো-সব কত-কত ধর্মদ্রোহীর সঙ্গে, সঙ্গে নিয়ে যাবে যারা পালিয়েছে তাদের ছবি, যাতে অন্তত তাদের প্রতিকৃতিগুলোকে পোড়ানো যায়।

১০

এক হাটবারে, পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান দাঁড়িয়েছিলো এক কানাগলির শেষে, ফিরি করছিলো খড়পোরা দুই অ্যালিগেটর, যা সে দাবি করলে সে কুস্‌কো থেকে এনেছে, যদিও এ-দুটো সে আসলে কিনেছে তোলেদোর এক বন্ধকী কারবারির কাছ থেকে। তার কাঁধে আছে এক বাঁদর, আর বাম ড্যানায় ব'সে আছে এক তোতা। এক মস্ত গোলাপি শাঁখে ফুঁ দিলে সে, আর অমনি লাল একটা সিন্দুক

থেকে বেরিয়ে এলো গোলোমন, কোনো মিরাকল নাটকের লুসিফারের মতো, হাতে বাড়ানো রকমারি পুঁতির মালা, মাথাধরা সারাবে এমন-সব মণিপাথর, ভিকুনিয়ার পশমে তৈরি কোমরবন্ধ, রাংতা মোড়া চুল আর পোতোসির কারিগর-দের বানানো আরো-সব তুচ্ছ ও অসার রংচঙে শিল্পদ্রব্য। যখন সে হাসলো, নেগ্রো বার ক'রে দিলে উকো দিয়ে ঘ'ষে চোখা-করা দাঁতের পাটি, আর ছুরির ঘায়ে তার দেশের উপজাতির রীতিমাফিক গালে নানারকম দাগ কাটা; তারপর, একটা তম্বুরা তুলে নিয়ে, সে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, কোমরটাকে এমনভাবে সোৎসাহে বাঁকিয়ে যে নাড়িভুঁড়ির বড়া বিক্রি করে যে ফোগলা বুড়ি সে শুদ্ধু সান্তা মারিয়ার খিলানের তলায় তার ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তার নাচ দেখতে। এখন যেহেতু মন্থর এস্পানি নাচ সারাবান্দ্, গিনেও আর শ্যাকঁই বুর্গোসের দারুণ উন্মাদনা, তাকে হাততালি দিয়ে বাহবা দিলে বিশাল ভিড়, যারা পরে নতুন জগৎ থেকে আমদানি-করা আরেকখানি নাচের জন্যে অনুনয় করলে। কিন্তু ঠিক তখনই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো; সব্বাই ছুটে গেলো আলশে আর ছাঁইচের তলায় আশ্রয় নিতে; আর পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান নিজেকে আবিষ্কার করলে এক পান্থশালার বৈঠকখানায়, যেখানে হুয়ান নামে আরেকজন তীর্থযাত্রী কড়িবসানো আংরাখা প'রে মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে সেখানে এসে হাজির। সে এসেছে সান্‌তিয়াগোর কাছে মানৎ রাখতে, ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে, প্লেগের এক ভয়ংকর মহামারীর সময় সে মানৎ করেছিলো। পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান সান্ লুথারে নেমেছিলো তার লাঠি আর লাউয়ের খোল নিয়ে, যার প্রতীকী তাৎপর্য হ'লো তীর্থযাত্রী তার মানৎ রেখেছে, তারপর তার আলখাল্লা খুলে রাখলে সিউদাদ রেয়ালে, যখন গোলোমন, হঠাৎ একদিন, এক বাঁদর আর তোতাপাখি নিয়ে তার কাছে এসে হাজির, মেলায় সব রংচঙে গয়নাগাটি বিক্রি করবার জন্যে; গোলোমনই তাকে বোঝালে যে ভাগ্যে থাকলে দু-দিনেই সে ইণ্ডিস থেকে আনা সব রকমারি নূতন জিনিশ বিক্রি ক'রে এতটাই মুনাফা লুঠবে যে সারা হপ্তাই তারপর মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে পারবে। তার জোরালো পুরুষত্বের কাছে শ্বেতাঙ্গিনীরা কীভাবে সাড়া দেয় সেটা জানবার জন্যে নেগ্রো ততক্ষণে তেতে উঠেছে; পশ্চিম ইণ্ডিসী কিন্তু রাস্তা দিয়ে কোনো নেগ্রো মেয়েমানুষকে যেতে দেখলেই তার মুণ্ডু হারায়, যাদের নখর পাছা যেন গির্জের গায়েনের বসবার তাকের মতো বেরিয়ে আছে। এখন গোলোমন তার রুমাল দিয়ে বাঁদরটার গা পুঁছছে, আর একটা পিপের কানায় ব'সে তোতাটা চুলুনির উদ্যোগ করছে। পশ্চিম ইণ্ডিসী মদ দেবার

হুকুম দিয়ে তীর্থযাত্রী হুয়ানের কাছে নানা লম্বাইচওড়াই আজগুবি গল্প ফেঁদে দিলে। সে বর্ণনা করলে অলৌকিক সঞ্জীবনী জলেভরা এক ঝরনা, যার জলে একবার স্নান ক'রে নিলেই এমনকী সবচেয়ে জরাগ্রস্ত বিকৃতদেহ বিকলাঙ্গও উঠে আসবে চকচকে চুল নিয়ে, গালের সব কোঁচকানো তোবড়ানো ভাঁজ উধাও, স্বাস্থ্য এতটাই পুনরর্জিত যে আস্ত এক আমাজোনি বাহিনীকে গর্ভবতী ক'রে দিতে পারবে। সে বললে ফ্লরিডার অম্বর মরকতের কথা, পুয়ের্তো ভিয়েহোতে কী-সব দানবমূর্তি দেখেছিলেন ফ্রান্সিস্কো পিথারো, কী-সব করোটি যার দাঁতগুলো তিন আঙুল পুরু, যার কান আছে কুললে একখানা, তাও আবার তার গর্দানে; কিন্তু তীর্থযাত্রী হুয়ান, মাল টেনে-টেনে তার মগজ ঘোলাটে আবছায়ায় ঝিমঝিম করছে, পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ানকে বললে যে ইণ্ডিস থেকে আসা লোকে সবসময়েই এ-সব তাচ্ছব কথা ফেনিয়ে বলে, আর শেষটায় কেউ তাদের কথা আর বিশ্বাসই করে না। চিরযৌবনের ঝরনায় কারু আর বিশ্বাস নেই, অন্ধরা যে-সব দিস্তে কাগজে আমেরিকার হাপিদানবীর গল্পকথা বেচে তারও কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে ব'লে কেউ মনে করে না। এই মুহূর্তে প্রজলন্ত বিষয় হ'লো ওমেগুয়া রাজ্যের মনোয়া নগরী, নয়া স্পেন বা পেরু থেকে নৌবহর যত সোনা নিয়ে এসেছে তার চেয়েও বেশি সোনা সেখানে ছড়িয়ে আছে শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায়। মায়া-শহর সেগোতা আর পোতোসির মাঝখানে যে-অঞ্চল (প্রকৃতির যা সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি) আর আমাজোনের মুখ এমন-সমস্ত পরমাশ্চর্যে ভর্তি যা কেউ কস্মিনকালেও আগে চর্মচক্ষে ছাখেনি: মুক্তাদ্বীপ, কোকেনরাজ্য, আর মহাসেনাধ্যক্ষ যে-পার্থিব স্বর্গভূমি দেখেছিলেন ব'লে দাবি করেছিলেন, রাজা ফার্দিনান্দকে লেখা তাঁর পত্র থেকে যার কথা সবাই জেনে গিয়েছে, কোনো মেয়েমানুষের স্তনের মতো এক পাহাড়সমেত সেই বিস্ময় নগরী। এক আলেমান নাকি নিজের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে এমন-এক রাজ্যের গুপ্তকথা নিয়েই মরেছে যেখানে ক্ষৌরকারের গামলা, রান্নার বাসনকোশন, কেৎলি, গাড়ির চাকার দাঁড়, আর বাতিদানগুলো অব্দি সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুতে তৈরি। আরো আবিষ্কারের উদ্দেশে নূতন-নূতন নৌ-যাত্রার ঢাক বাজছে এখনও, কিন্তু এখানে পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান তীর্থযাত্রী হুয়ানকে বাধা দিয়ে বললে পিথারো আর তাঁর বহরের এ-সব বিজয়অভিযানই কিন্তু সবচেয়ে লাভজনক ব্যাপার নয়। ইণ্ডিসে যা থেকে সবচেয়ে নাফা আসে তা হ'লো দিগ্‌দর্শিকার কাঁটার মতো এক মন আর চৌকশ বিচারবুদ্ধি ও নৈপুণ্য—আর সকলের আগে লাফিয়ে এগুবার ক্ষমতা; রাজার ফরমান-পরোয়ানা, স্নাতকদের

বিধিআপত্তি বা বিশপদের চ্যাঁচামেচিতে কান দেবার কোনো কারণ নেই, যেখানে ইনকুইজিশন নিজেই সহজ আর নির্ঝঞ্ঝাট হ'য়ে গেছে, আর ধর্মদ্রোহীদের মাংস পোড়াবার বদলে যেখানে চকোলেটের পেয়ালাই আগুনে গরম করা হয়···সেখানে এস্পানিওলায় বাজানো ঢাক কখনও কাউকে ধনদৌলতে কাছে নিয়ে যাবে না। যে-সব ঢাক শোনা উচিত, তা বাজছে সমুদ্রের ওপারে, কারণ তারাই শোনায় মরদদের জন্যে নতুন-নতুন খোলা রাস্তার কথা, আগের মতো বেশি লড়াই না-ক'রেই যে-রাস্তা দিয়ে গিয়ে তুলকালাম ঐশ্বর্য উপার্জন করা যায়, যদি জানা যায় চিকিৎসকের বিদ্যা—কী ক'রে জোড়া দিতে হয় ভাঙা হাড়, অথবা ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব ভেষজে কী ক'রে সারাতে হয় বুনো জন্তুর কামড়।

১১

পরদিন, তার ঢোলা আংরাখা থেকে কড়িগুলো খুলে যার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলো সেই মেয়েকে দিয়ে দেবার পর, তীর্থযাত্রী হুয়ান সান্‌তিয়াগোর রাস্তা ছেড়ে সেভিইয়ের দিকে বেরিয়ে পড়লো। পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান গেলো তার পেছন-পেছন, থক-থক কেশে আর হা ক'রে ফোঁশ-ফোঁশ নিশ্বাস ফেলে, কারণ সে সিয়েরারার হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেছে। যখন সে রাস্তার এক পান্থশালায় কাঁপুনি দিতে-দিতে খড়ের জাজিমে শুলো, সে কামনাতুরভাবে ভাবলে দোনিয়া যোলোফা আর দোনিয়া মান্দিঙ্গার রুক্ষ চামড়ার উষ্ণ আরামের কথা। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কাতরভাবে প্রার্থনা করলে রৌদ্রের জন্যে, কিন্তু সাড়া এলো দমকা এক বৃষ্টির ঝাপটায়, সমভূমির ধূসর গন্ধকবর্ণ খোয়াপাথরে ঝ'রে পড়লো বাদল, ভিজে একশা ভেড়াগুলো জড়াজড়ি ক'রে রইলো এক জলগর্ত ঘেরা সবুজ ঘাসের মাঠে, কাদায় তাদের খুর ডুবিয়ে। গোলোমন এলো পেছনে, খালি পা, বাঁদর আর তোতাটাকে তার ঢোলা কুর্তার আড়ালে ঢেকে, তার খড়ের টুপি কনকনে হাওয়ায় উচনো। ভাইয়া দোলিদে তাদের আমন্ত্রণ জানালে সম্রাটের উপদেষ্টার স্ত্রীর জীবন্ত মাংস ঝলশাবার চিতারগন্ধ, তাঁর বাড়িতে নাকি লুটারবাদীরা জমায়েৎ হ'য়ে প্রার্থনা করতো। এখানে সবকিছু থেকেই পোড়ামাংসের গন্ধ উঠছে, নাকে আসছে জলন্ত সান্ বেনিতোর গন্ধ, শিকেঝলশানো ধর্মদ্রোহী ওলন্দাজদেশ আর ফরাশিভূমি থেকে ভেসে আসছে কয়েদীদের আর্তনাদ, জ্যান্ত কবর-দেয়া স্ত্রীলোক-দের বিলাপ, মানুষবলির তুলকালাম হুলুস্থুল, তলোয়ার খুঁচিয়ে মেরে ফেলা মায়ের পেটের অজাত শিশুদের ভয়ংকর আর্তনিনাদে ভেসে আসছে অভিশাপ। কেউ-

কেউ বললে এই অশ্রু আর রুধির থেকেই উঠে আসবে সুদিন ; অন্যরা চেঁচিয়ে বললে ষষ্ঠ মুদ্রা খোলা হ'লো, সূর্য এবার 'লোমজাত কম্বলের মতো কৃষ্ণবর্ণ' হ'য়ে যাবে, আর মর্তপৃথিবীর রাজা, রাজকুমার, ধনবান ও নেতারা, ক্ষমতাসীন সকলেই, সব দাস ও মুক্ত মানুষ, সবাই গিয়ে আশ্রয় নেবে গুহায় ও পাহাড়ে। কিন্তু সিউদাদ রেয়াল ছাড়িয়ে যেতেই মনে হ'লো এখানে লোকে অন্যরকম আছে। ফ্ল্যাণ্ডার্সে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সে নিয়ে তারা আদৌ টুঁ শব্দটিও করে না, তারা উৎকর্ণ হ'য়ে আছে সেভিইয়ের দিকে, অনুপস্থিত ছেলেদের খবরের জন্যে উৎসুক, কারু বা কোনো খুড়ো তার কামারশাল সরিয়ে নিয়ে গেছে কার্তাহেনায়, আর এক মামা দারুণ একটা সরাই খুলেছে লিমায়। কোনো-কোনো গাঁ থেকে সংসারের পাটই চুকিয়ে ফেলেছে আস্ত-আস্ত পরিবার ; পাথরকাটিয়েরা আর তাদের মজুররা, অবস্থার ফেরে-পড়া ভদ্রলোক তার ঘোড়া আর দাসদাসী সমেত কেটে পড়েছে। পশ্চিম ইণ্ডিসী হুয়ান আর তীর্থযাত্রী হুয়ান আরো দ্রুত করলে তাদের পদক্ষেপ, যখন বেগুনের বেগনিলাল আর কুমড়োর তামাটেখয়েরির মধ্যে দেখতে পেলে নারঙ্গের ঝোপগুলো, যাদের মধ্যে গিয়ে ভিড়েছে তরমুজেরও এক খেত। পুনরাবির্ভূত হ'লো শাদা মদের দোকানগুলো, আর নেগ্রো মেয়েরা—ঝলশানো নাশপাতি-রঙের মতো তামাটে চামড়া তাদের, তাদের নিতম্ব বেরিয়ে আছে গির্জের গায়েনদের বসবার জন্যে দেয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা তাকের মতো। লোনাজল, আলকাৎরা আর লাক্ষার গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বন্দরের ওঠানামার হাঁকডাক হৈ-হৈ। আর যখন সঙ্গে পুঁতিগুলো ব'য়ে আনা নেগ্রোকে নিয়ে দুই হুয়ান এসে পৌঁছুলো কাসা দে লা কোন্‌ত্রাতাসিওন-এ, দুজনকে দেখে এমন লটকজোড় এমন মানিক-জোড় পাজির পাঝাড়া ব'লে মনে হ'লো যে মাল্লাদের কুমারীমাতাও তাদের তাঁর বেদির সামনে হাঁটুগেড়ে বসতে দেখে ভ্রূকুটি করলেন।

'যেতে দিন এদের, দিব্যজননী,' বললেন সান্‌তিয়াগো [সেণ্ট জেমস] জেবেদি আর সালোমির পুত্র ; এই ধরনের পাজি বদমাশের কাছেই শত-শত নূতন নগরীর পত্তনের জন্যে তিনি ঋণী। 'এদের যেতে দিন ; এরা ওখানে গিয়ে আমার কাছে ওদের মানৎ রাখবে।'

আর বেলজেবাব, আগের মতোই সে উদ্ভাবননিপুণ, ছদ্মবেশ প'রে নিলে ছেঁড়া কাঁথায় সাজা এক অন্ধের, মাথার শিং দুটো ঢেকে রইলো মস্ত এক কালো টুপি, আর যখন সে দেখলে যে বুর্গোসে বৃষ্টি একটু থেমেছে, মেলার একটা গলির এক বেঞ্চির ওপর সে উঠে পড়লো, আর যখন তার লম্বা-লম্বা আঙুল ঘুরে

বেড়াতে লাগলো তার ভিহুয়েলার তারের ওপর, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক গান ধ'রে দিলো :

সুতরাং, মহোদয়জনেরা,
সবে আজ হোন উৎফুল্ল
হঠুক দুঃখ কায়মনেরও,
কেননা কপাল আজ খুললো।
শুনুন, তাহ'লে, তোফা সন্দেশ—
স্বপ্ন ফলবে এক নিমেষে—
কষ্টের থাকবে না কোনো লেশ
সবপেয়েছির ঐ বিদেশে।
গরিব ? কষ্ট খুব ? তাতে কী ?
যত হোক আপদের হামেলা—
ওদেশে নিছক পদপাতে তো
দূরে যাবে যাবতীয় ঝামেলা।
স্বপ্নের দেশে যেতে কী ?, রাজি ?
আসুন, তাহ'লে, চ'লে এ-ধারে—
একসাথে দশখানা জাহাজই
সেভিইয়ে থেকে যাবে এবারে।
সুযোগ এসেছে, মিছে কে ফিরে
থাকবে কাহিল প'ড়ে দুঃখে ?
লেখান জাহাজে নাম অচিরে,
হেলায় ফেরায় সব সুখ কে ?

ওপরে, ছায়াপথে-ছায়াপথে শুভ্র হ'য়ে ছিলো তারকাখচিত আকাশ।

BIVAV

Price : Rs. 8·00 | Special 39th Issue | Reg. No.
Vol. 11. No. 1 | Published in Feb 88 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970—1885